



২৮ এপ্রিল ২০২২

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ”



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



২৮ এপ্রিল ২০২২

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ”

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



Department of Inspection for
Factories & Establishments

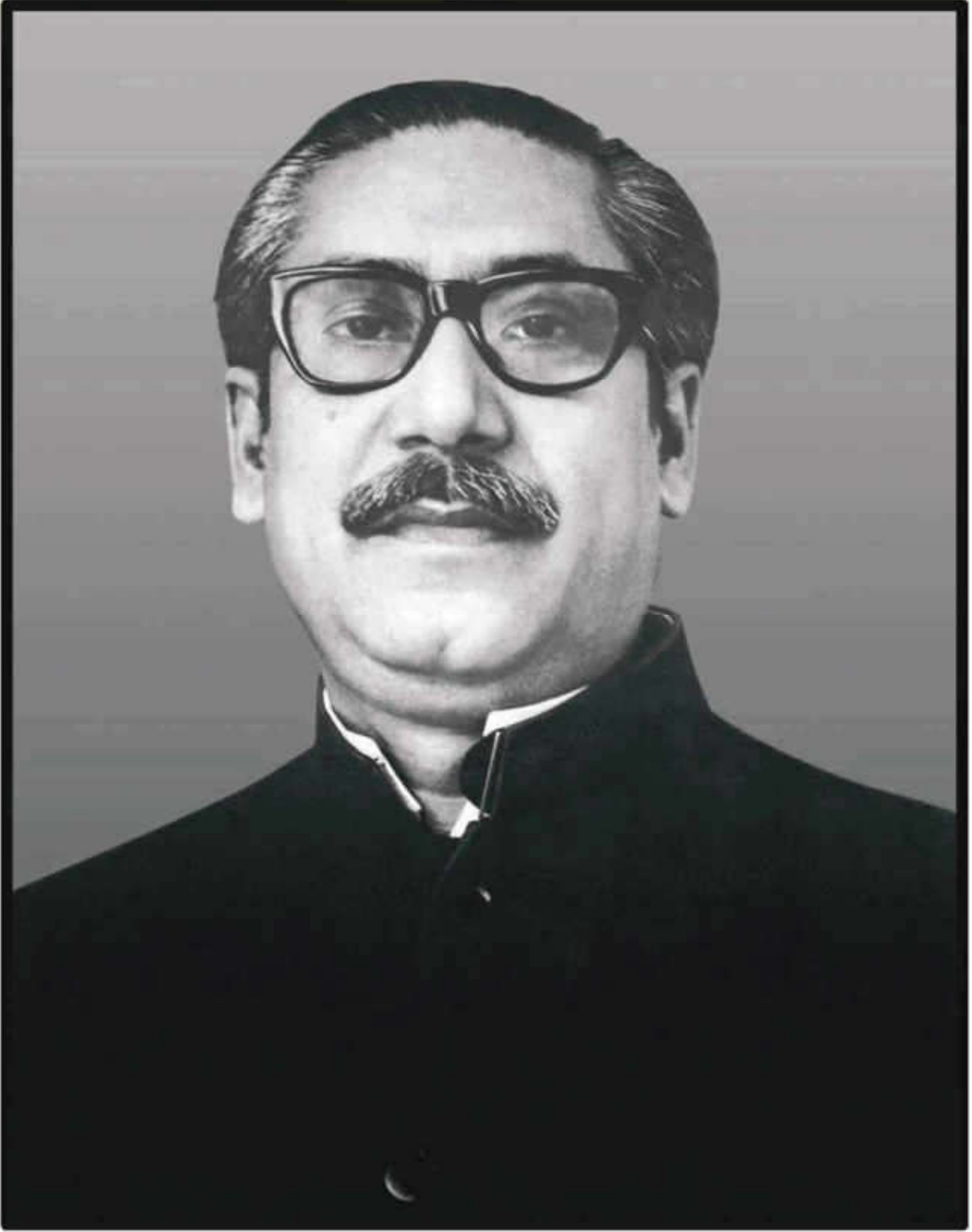


International
Labour
Organization

Canada



Kingdom of the Netherlands



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৫ বৈশাখ ১৪২৯
২৮ এপ্রিল ২০২২

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ' সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তিনি পরিত্যক্ত কলকারখানাসমূহ জাতীয়করণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৫টিসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। এ সকল পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকারখানাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫'। আমি দেশে বিদ্যমান এ সকল আইন ও বিধিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে অনুধাবন করতে হবে। বাংলাদেশে বিগত এক দশকে শিল্প-কারখানার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংখ্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলা খুবই জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


মোঃ আবদুল হামিদ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাখ ১৪২৯

২৮ এপ্রিল ২০২২

বাগী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এবারের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের প্রতিপাদ্য ‘নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ’ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মহান স্বাধীনতার পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকারের বিষয় সুদৃঢ় করেন। জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭৩ সালে পহেলা মে’কে ‘মে দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজীবন শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

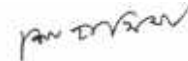
আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজনসহ তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছে এবং ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩’ এবং ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫’ প্রণয়ন করেছে। আমাদের সরকারের উদ্যোগে রাজশাহীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কারখানার মালিক পক্ষকে অনুপ্রাণিত করতে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ০৬টি শিল্প সেक्टरের ৩০টি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে ‘খিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ প্রদান করা হয়েছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত নিয়মিত শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ, সেইফটি কমিটি গঠন, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন এবং মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা কোভিড-১৯ অতিমারিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সরকারের সময়োচিত উদ্যোগের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে।

মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীলগ্নে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। এ অনন্য অর্জনে দেশের মেহনতি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে দিবসটির গৃহীত সকল কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি, ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল দেশে ৭ম বারের মতো “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য করা হয়েছে “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ।”

দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মপরিবেশ শোভন ও নিরাপদ করার বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার মাধ্যমে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতায় এ অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর ও সংস্থা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কেবল সরকারি উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা কঠিন। সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় বর্ণিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক পালনীয় বিষয়গুলো সকল কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নে সকলকে যত্নবান হতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিধিসমূহ পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্যপূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে গৃহীত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য শোভন কর্মপরিবেশ, টেকসই উৎপাদন, টেকসই শিল্পায়ন ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

টিপু মুন্সি, এমপি



প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

উন্নয়নের মূল উপাদান হচ্ছে উৎপাদন। উৎপাদনের প্রধান অনুসঙ্গই হচ্ছে শ্রমিক। উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিবারের ন্যায় ২৮ এপ্রিল “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করছে।

জাতীয় পর্যায়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপনে আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি নিপীড়িত, নির্যাতিত, অধিকারহারা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শ্রমিকের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সকল শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন। জাতির পিতার সময়োচিত ও যথাযথ পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কলকারখানাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষা, আইনগত এবং ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার এবং প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করে দক্ষ হাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২৮ এপ্রিল World Day for Safety and Health at Work পালন করে আসছে। “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩” অনুসারে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ ও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পরিবেশ সম্পর্কে সমন্বিত সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১৬ সাল থেকে ২৮ এপ্রিল পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিক নির্দেশনায় দেশ এগিয়ে চলার কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। এই অর্জনে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মালিক ও শ্রমিক সকলকে হাতে হাতে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের দ্বারপ্রান্তে এবারের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের প্রতিপাদ্য “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” সময়োচিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের।

বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি



সভাপতি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর উদ্যোগে “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ”-প্রতিপাদ্য নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবছর বাংলাদেশে সপ্তমবারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২। ডাইফের এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ভাই-বোনসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণের নিকট সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে এবং কর্মক্ষেত্র নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পালিত এই দিবসটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আমাদের সকলকে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেয়। শ্রমিক, মালিক ও সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাই কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা। বর্তমান সরকার শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্ণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। এজন্য শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে নানামুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে দেশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ সৃষ্ট অতিমারি প্রতিরোধে ডাইফের কার্যক্রম প্রশংসার দাবি রাখে। অধিদপ্তরের টেলিমেডিসিন সেবা, হেল্প লাইন, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রচারণা, বিশেষ পরিদর্শন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি শ্রমখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম এই সঙ্কটকালে শ্রমখাতসহ দেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং সেইফটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মুজিবুল হক



সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে বিগত বছরের ন্যায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস -২০২২ পালনের লক্ষ্যে সহায়ক স্মরণিকা প্রকাশের নিরন্তর প্রচেষ্টার জন্য বিকেএমইএ’র পক্ষ থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

‘২০৩০ এজেন্ডা’ তথা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিয়ামকসমূহ যথা সুরক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মতো ক্রসকাটিং বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও দূরদর্শী নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ, যা সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবীদার। আর এই অদম্য অগ্রযাত্রায় সহযোগী হতে পেরে আমরা গর্বিত।

বিকেএমইএ মনে করে শোভন কর্মপরিবেশ প্রাপ্তি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত। এটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নীটশিল্পের অন্তর্ভুক্ত কারখানাগুলো আরও নিরাপদ, দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে এবং বিশেষভাবে কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের বাড়তি নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আর এজন্য বিকেএমইএ তার অন্তর্ভুক্ত কারখানাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে, সম্মানিত মালিকগণ ও তাদের প্রতিনিধিবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আগ্রহ প্রকৃত অর্থে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং প্রশংসার দাবীদার।

শোভন কর্মপরিবেশ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি অন্যটির পরিপূরক। সমগ্র দেশব্যাপী অতিমারি কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি নাজুক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। তবে, কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রেক্ষিতে ক্রমশ সংক্রমণ ও মৃত্যুহার কমছে। অধিকন্তু, সুরক্ষা অটুট ও স্থিতিশীল রাখার জন্য গণটিকা কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইনের আয়োজন, বুস্টার ডোজ গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান সর্বোপরি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ধারা গতিশীল থাকার দরুন ধীরে ধীরে একটি স্বস্তির অবস্থানে উপনীত হচ্ছি যা একটি সুখকর বিষয়।

এই ধরনের ধারাবাহিক প্রকাশনা কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জীবনমান উন্নয়নকরত আরও উন্নত জীবন নিশ্চিতকরণ তথা একটি সুস্থ জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি



সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ”- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) মোকাবিলায় সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে এ বছর দিবসটি পালিত হবে। সকল কর্মক্ষেত্রে কাজের শোভন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ মহামারির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এঁর দৃঢ় নেতৃত্বে ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়টি পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষানীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিটি অধিদপ্তর ও সংস্থা থেকে নেওয়া হয়েছে নানাবিধ কার্যক্রম। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে কর্মহীন হয়ে পড়া এবং দুস্থ শ্রমিকদের জন্য প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে প্রদানের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিশেষকরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর হতে চালু করা হয়েছে টেলিমেডিসিন সেবা, সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) সেবা, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বিশেষ পরিদর্শন, শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মাঝে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কার্যক্রম পরিচালনাসহ আরও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় গঠন করা হয়েছে সেইফটি কমিটি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI)-এর নির্মাণ কাজ চলছে।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দিবসটি পালনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের কারিগরি সহায়তার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবছর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যেতে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

মোঃ এহছানে এলাহী



মহাপরিদর্শক

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয়ভাবে ২৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” পালন করা হচ্ছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সাল থেকে ২৮ এপ্রিল দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। এ দিবসের প্রাক্কালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিল্পায়নের এযুগে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি অনেক তাৎপর্য বহন করে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আজকের বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ। ইতোমধ্যে দেশে মাথাপিছু আয় আড়াই হাজার ডলার অতিক্রম করেছে। দেশে উল্লেখযোগ্য হারে কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে শিল্প কলকারখানার গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প কলকারখানার মূল চালিকা শক্তি হলো শ্রমিক শ্রেণি। আর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার অন্যতম নিয়ামক।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই দেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (NOHSTRI) নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুলাই, ২০২২ হতে শুরু হতে যাওয়া উক্ত ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলি, সেইফটি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, মাতৃত্বকল্যাণ, অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করার জন্য কারখানা, দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান প্রভৃতি পরিদর্শন করে। জাতীয় উদ্যোগের আওতায় অ্যাসেসমেন্ট করা ১ হাজার ৫৪৯টি কারখানার মধ্যে ৬৬৬টি চালু কারখানার স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ফায়ার সেইফটি সংক্রান্ত সংস্কার কাজ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তদারকি করেছে। এছাড়াও নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে গড়ে উঠা ৬৫৬টি রেডিমেড গার্মেন্টস, ২৯৮টি প্লাস্টিক ও ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১ হাজার ১০১টি কারখানার স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল, ফায়ার এবং কেমিক্যাল ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্ত পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ট্যানারি, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশম শিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ মোতাবেক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে যা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে। এছাড়াও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল প্রকাশ করা হয়েছে।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে অন্যদিকে শ্রমিকের জীবনমানে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চয়তা নিয়ে আসে। আগামীর বাংলাদেশ শোভন কর্মপরিবেশের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করবে-আজকের দিনে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।


মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ



মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলপক্ষে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ দিবসের প্রাক্কালে যাদের অক্লান্ত শ্রম-ঘামে অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে তাদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট। এ সরকার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন, বিভিন্ন শ্রম সেक्टरে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ সহ বিভিন্ন শ্রমবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকার দেশের মেহনতি মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কলকারখানায় শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প নেই। কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মতো বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিই এ দিবস উদযাপনের সফলতা বলে মনে করি।

আমি “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস -২০২২” উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

খালেদ মামুন চৌধুরী, এনডিসি



মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ।” আমি এ কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। দেশে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমানহারে বহুতল/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি। এ স্বপ্ন পূরণ করতে হলে সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ কর্মজীবী সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করা একটি অন্যতম শর্ত। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে শিল্প কারখানায় কর্মরত সকলের নিরাপত্তা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা-বিষয়ক প্রাপ্যতা প্রতিটি শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এ লক্ষ্যে সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপত্তা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। শুধু সরকারি উদ্যোগে সকলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগত কাজে নিয়োজিতদের জন্য শতভাগ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাটা দুরূহ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে। বিশ্ববাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, এই লক্ষ্যপূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগে বছরব্যাপী পরিদর্শন, গণসংযোগ, মহড়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২” উদযাপনের সকল কার্যক্রম একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলায় সফল হবে বলে আশা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন,
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল



**International
Labour
Organization**

Country Director
ILO Country Office for
Bangladesh

Message

The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of workplace safety and health in protecting the workforce and in ensuring continuity of economic activities. Many workplaces with strong occupational safety and health (OSH) culture and systems in place have shown positive resilience by taking proactive steps to safeguard their work environment and cope with the devastation caused by the pandemic.

A strong OSH system requires meaningful participation of governments, employers, workers, public health actors and all relevant parties at national and enterprise levels. The collaboration among these actors is essential for ensuring that the preventive measures for managing workplace hazards are acceptable and supported by employers and workers, and to be effectively implemented in practice.

It is heartening to see that in Bangladesh, the government, employers' and workers' organizations are working together to continue strengthening of the OSH institutional and regulatory frameworks and the OSH management system.

The Ministry of Labour and Employment recently published the first National Plan of Action on OSH (2021-2030) which includes strategies for stronger enforcement of workplace safety and health in all industries. The National Profile on OSH, which summarizes the existing OSH policies, laws, institutions and situation in the country, was updated last year.

At the onset of the pandemic, the government introduced a National OSH Guideline on COVID-19 to help organizations create safe return-to-work conditions.

The ILO's 'Improving Working Conditions in the Ready-made Garment Industry' programme, funded by the Netherlands and Canada, collaborated with the government, employers, workers' organizations and other stakeholders to provide technical support for the development of these crucial policy instruments for Bangladesh.

Now is the time to reap the fruit of these policies through their effective implementation across all industries.

At enterprise level, a strong OSH culture is created through active involvement of both management and workers in the ongoing improvement of safety and health at work. This requires open communication and dialogue built on trust and mutual respect. Social dialogue between all parties can facilitate the process by providing a safe platform to discuss and find responses to difficult situations related to safety and health in the workplace.

Therefore, investing in OSH systems and in social dialogue should go hand in hand for managing workplace hazards and any future crises that might lie ahead.

Safe and healthy working conditions are fundamental to decent work. Let us continue to act together and move towards creating a safe and healthy work culture for all Bangladeshis.

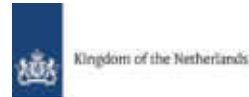
Tuomo Poutiainen



Lilly Nicholls
High Commissioner,
Canada High Commission



Anne-van-Leeuwen
Ambassador, Embassy of
the Kingdom of the Netherlands



Joint Statement by Development Partners

The World Day for Safety and Health at Work this year explores the participation and social dialogue in creating a positive safety and health culture. It is befitting that, as Bangladesh has just celebrated its 51st year of existence and is on the cusp of graduating from the LDC status, the theme being used for the country on this occasion is, “Ensuring decent work for the Prosperity of Bangladesh”.

We are pleased to note that the National Industrial Health and Safety Council took the initiative to approve the OSH National Plan of Action (NPA) in September last year. We commend the Government of Bangladesh for undertaking extensive consultations in finalizing the NPA and for sharing it with stakeholders and making it available on the website of the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE). The NPA is aimed at regulators, industries, trade unions, other organizations and governments that in turn influence work and workplaces across Bangladesh. The NPA covers the legal framework, improvement of institutional capacity, information management and dissemination and promotional activities for awareness raising and advocacy and for a safety culture. Canada and the Netherlands are providing the technical support in the development of this policy instrument through the “Improving Working Conditions in the Ready-made Garment” program that is implemented by the ILO.

It is vital that efforts be put in place now to operationalize the OSH-NPA measures and strategies to address workplace accidents and occupational hazards. As development partners of Bangladesh, we believe that an OSH system involving a meaningful participation of all major stakeholders (i.e., government, employers, workers, particularly the female garment workers, public health actors and all relevant parties at the national and enterprise level) is vital for protecting working environments and safeguarding the safety and health of workers.

Workplace safety in Bangladesh is a matter of utmost importance to us. Consumers in countries around the world are intensely interested in the working conditions under which their apparel and other consumables are produced. All of Government endeavour is essential to ensure workplace health and safety. This should include identifying factories at risk, which will help to immediately take action and potentially save the lives of workers.

We wish Bangladesh a happy National Occupational Safety and Health Day!



সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশন

বাণী

২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অন্য বছরের মতো “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোভিড-১৯ মহামারি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়ে আমাদের আরো বেশি ভাবনার জায়গা তৈরী করে দিয়েছে। কেননা মহামারি চলাকালীন সারা বিশ্ব যখন স্থবির হয়ে পড়েছিল তখনও শিল্প-কারখানায় সকল সেইফটি সামগ্রী ও সচেতনতা গ্রহণপূর্বক উৎপাদন অব্যাহত ছিল। আমাদের দেশেও উৎপাদনের চাকা সীমিত সময়ের জন্য বন্ধ থাকলেও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তা আবার মালিক-শ্রমিক উভয়ের প্রচেষ্টায় সচল করা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টির প্রতি আরো বেশি জোর দিতে হবে।

শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে জড়িত। শ্রমিক শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেই তার মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে এবং শরীর ও মন ভালো থাকলেই কাজে তার প্রভাব পড়বে অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে তার থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হবে। তাই স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্রে শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এবারের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসটি এমন একটি সময়ে পালিত হচ্ছে যখন সারা বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারি থেকে স্বস্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশান্বিত হতে পারি যে, সম্ভবত এই মহামারি খুব শীঘ্রই শেষ হতে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আইন সংশোধনসহ অনেক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। যার ফলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কর্মক্ষেত্রে সমূহ অনেকটাই নিরাপদ। সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সরকারি চাকরিজীবীদের বাইরেও দেশের নাগরিকদের যারা বেসরকারি খাতে কর্মরত তাদেরকে পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে যাচ্ছে। দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে আগামী এক বছরের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি চালু করা। এই কর্মসূচি চালু হলে আমাদের সকলের জন্যই স্বস্তিদায়ক হবে। বঙ্গবন্ধুর কন্যার এই মহতী উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

সর্বশেষ, দিবসটি উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গিক সাফল্য কামনা করছি।

আরদাশীর কবির



সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২৮ এপ্রিল দিনটিকে বিশ্বব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। বাংলাদেশও ২০১৬ সাল থেকে দিবসটি উদযাপন করে আসছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের এই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” কেবল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা সরাসরি সম্পৃক্ত। টেকসই শিল্প গড়ে তুলতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

বিজিএমইএ বিশ্বাস করে যে, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা শ্রমিক ভাইবোনদের অন্যতম মৌলিক অধিকার-শোভন কাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ করতে ও শ্রমিক ভাইবোনদের স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ সবুজ শিল্পায়নেও নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক সবুজ কারখানার আবাসস্থল এখন বাংলাদেশ। বর্তমানে পোশাক শিল্পের ১৫৭টি কারখানা ইউএসজিভিসি থেকে সনদপ্রাপ্ত। এগুলোর মধ্যে ৪৭টি প্লাটিনাম রেটেড এবং আরও ৫০০টিরও অধিক কারখানা সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে।

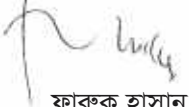
পোশাক শিল্প আজ নিরাপদ কর্মপরিবেশের রোল মডেল। বিগত এক দশকে উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সরকার, ব্র্যান্ড/ফ্রেতা, উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীদার সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে তৈরি পোশাকখাতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, টেকসই উন্নয়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে তা অব্যাহত রাখতে পোশাক শিল্প দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সম্প্রতি সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রকাশ করেছেন। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পোশাক শিল্প সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

উৎপাদনের প্রবহমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পোশাক শিল্প নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

আমি আশা করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২২ উদযাপনে সাফল্য কামনা করছি।


ফারুক হাসান



সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ডায়নামিক লিডারশিপে ২৮ এপ্রিল ২০১৬ সাল হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশে “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস- ২০২২ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা শ্রমজীবীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের।

মহান স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল, কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা যেমন ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার তেমনি তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নের চাবিকাঠি।

বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগ আপসহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের শ্রমিক সমাজের অবদান অপরিসীম।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকের জীবনমান ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। রাজশাহীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আপসহীন থেকে সরকার-মালিক-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে গঠনমূলক, দায়িত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

নূর কুতুব আলম মান্নান



সম্পাদকীয়

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ”-প্রতিপাদ্য নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবছর সপ্তমবারের মতো পালিত হচ্ছে “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২”। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল সারা বিশ্বে পালিত হয় “World day for safety and health at work”, যা আমাদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আরও সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেয়। শ্রমিক, মালিক ও সরকার সবাই কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা।

আমাদের জাতীয় জীবনে এ দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ভিশন-২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। দেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। তাই এসব শিল্পের কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ রাখার কোন বিকল্প নেই।

জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাস এবং টেকসই উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ নির্ধারিত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ অর্জন তথা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই।

মালিক, শ্রমিকসহ শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে দিবসটিতে আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক স্মরণিকা প্রকাশ করছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ গুণীজনের বাণী, নির্দেশনা ও লেখা এ স্মরণিকায় স্থান পেয়েছে যা বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় পাথেয় হয়ে থাকবে। এই স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকায় মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত অন্যান্য ভুল (যদি থাকে) সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। সবাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতন হোক; কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এই হোক এ দিবসের অঙ্গীকার।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ



প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান:

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদক:

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী:

ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কারিগরি সহযোগিতায়:

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও)

প্রকাশনা:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল:

এপ্রিল, ২০২২

ডিজাইন ও প্রিন্ট:

শৈলী প্রিন্টার্স
০১৭৩৩২৪১৮২৬

স্মরণিকা ও ফ্রোডপত্র প্রকাশনা উপকমিটি এবং সহযোগী কমিটির সদস্যবৃন্দ

আবু হাসনাত মোঃ মঈনউদ্দিন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বেগম শাহীন আখতার, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সুকান্ত বসাক, সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মনোয়ারা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মোঃ আকতারুল ইসলাম, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মোছাঃ দেলোয়ারা খাতুন, সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মোঃ মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সাবিহা মুক্তা, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মিসেস মিতসু শাওলীন, উপপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
বেগম মোরশেদা হাই, সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ মিজানুর রহমান জনি, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
রাজু আহমেদ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
নুসরাত জাহান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ফরহাদ মাহমুদ সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
এ, কে, এম, মাছুম উল আলম, প্রোগ্রাম অফিসার (Labour Inspection & OSH), ILO
মোঃ রাশেদুল আলম, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ আব্দুল মজিদ, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ মুনছুর বিল্লাল, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শান্তা দেব মনি, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
জিয়াউল হক, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ শরিফুল ইসলাম, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ওহীদুর রহমান, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
উম্মে সালামা, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

০১

নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

৪৩

০২

Workplace Safety in Bangladesh

George Faller

৪৬

০৩

শোভন কর্মপরবেশ ও উৎপাদনশীলতা: বিকেএমইএ'র কার্যক্রম

এ.কে.এম. সেলিম ওসমান, এমপি

৪৯

০৪

পোশাক শিল্পে শোভন কর্মপরবেশের অগ্রযাত্রা

ফারুক হাসান

৫২

০৫

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির উন্নয়নে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ভূমিকা

আরদাশীর কবির

৫৪

০৬

গণমানুষের সুরক্ষায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন

৫৬

০৭

Embassy of Denmark: OSH in Bangladesh is the foundation for sustained growth

SØREN ALBERTSEN

৫৮

০৮

The Return of Investment (ROI) of Positive Safety Culture

Gholam Muktedir

৬০

০৯

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং টেকসই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি

মোঃ আলম হোসেন

৬২

১০

গিগ ইকোনমি: পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

৬৫

১১

Occupational Hazards

Sk Akhtar Ahmad

৬৮

১২

কর্মক্ষেত্রে কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া

৭৪

১৩

Go Green And Make An Environmentally Conscious Workplace

Dr. Irin Hossain

৭৬

১৪

আলোকচিত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম আলোকচিত্রী: রিয়াজ মাহমুদ মিঠু

৭৯

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ”



মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিবসটির উদ্দেশ্য সারাদেশে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই দিবসে নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এবছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)’র প্রতিপাদ্য হলো “To build positive safety and health culture, let’s act together।” সকল কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সকলের সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। দেশে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে মালিক-শ্রমিক-সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষকে একসাথে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে এবছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো “নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” অর্থাৎ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে স্বাস্থ্যকর, শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। দেশের বিশাল শ্রমখাতকে সুরক্ষিত রাখতে পারলেই কেবল দেশ উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী দেশের কারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এক্ষেত্রে মালিক, শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থার মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। কারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত, তাৎক্ষণিক ও বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমেই অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ দেশের শ্রমখাতকে স্থিতিশীল রাখার সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

শ্রম পরিদর্শন:

দেশের কারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৪৭,৩৬১টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি:

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে সরাসরি এবং হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এর মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫২৩৬টি অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাপ্ত সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সেইফটি কমিটি গঠন:

কলকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি পোশাক কারখানা সহ অন্যান্য কারখানায় মোট ৫৭৮৯টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রম আইন মোতাবেক প্রয়োজ্য কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান:

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ডাইফের পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩৩,৬০,০০০ টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ১,৬৬,০০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

গণশুনানি নিষ্পত্তি:

শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইন ও বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে আনীত আপত্তি সমাধানের জন্য শ্রমিক ও মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে নিয়মিত গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭৯৩টি আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ৬২১টি আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন:

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন এই অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,০২৪ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩৩,৪৫২টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন ফিসহ অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত ৫,৮৯,০৮,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে এই অধিদপ্তর।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ:

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাইফের তত্ত্বাবধানে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১৪,৯৫৯ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩ টাকা।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা:

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৯৫৭টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি:

ঈদ উৎসব ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সারাদেশে পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ও ছুটি নিশ্চিতকরণসহ সকল প্রকার শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ২৩টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিরলস কাজ করছে। শ্রম খাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকগণ কর্তৃক তা নিরসন করার চেষ্টা করা হয়। উৎসবের পূর্বে কোনো শ্রমিকের ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ রোধকরণেও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো কাজ করে।

শিশুশ্রম নিরসন:

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করার নিমিত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিৎড়ি, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রঙানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা, রেশম খাত থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক 'আইএলও কনভেনশন-১৩৮' অনুসমর্থন করেছে। সর্বোপরি ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। শিশুশ্রম নিরসনে বর্তমানে এক বছর মেয়াদি action plan বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও ইউনিসেফ এর সাথে দুই বছর মেয়াদি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে।

শিশুকক্ষ স্থাপন:

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মোট ৪৫০ টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৪১০ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি:

কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করার পর তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৪২১টি।

ক্রটিপূর্ণ কারখানা সংস্কার:

ক্রটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ সমন্বয়ের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে প্রকল্পের মাধ্যমে Remediation Coordination Cell (RCC)-গঠন করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কারখানার সংস্কার কাজ তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ফায়ার সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষিত জনবলের সমন্বয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেইফটি ইউনিট (ISU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় উদ্যোগের আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত ১ হাজার ৫৪৯টি কারখানার মধ্যে ৬৬৬ টি চালু কারখানার স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ফায়ার সেইফটি সংক্রান্ত সংস্কার কাজ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তদারকি করছে। এছাড়াও নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে গড়ে উঠা ৬৫৬টি রেডিমেড গার্মেন্টস, ২৯৮টি প্লাস্টিক ও ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১ হাজার ১০১ টি কারখানার স্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল, ফায়ার এবং কেমিক্যাল ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্ত পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:

শ্রমিক, মালিক, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRU)”-এর নির্মাণ কাজ চলছে। শ্রমিক দুর্ঘটনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে এটিই প্রথম ইনস্টিটিউট।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন:

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস’ পালন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল এই দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, স্মরণিকা প্রকাশ, শিল্পঘন এলাকায় ট্রাক শো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা, গণমাধ্যমে প্রচারণা, মোবাইলে খুদে বার্তা প্রেরণ, সারাদেশে পোস্টারিংসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহ উন্নয়ন সহযোগী অন্যান্য রাষ্ট্র ও সংস্থা সহযোগিতা করেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বীকৃতি প্রদান:

দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য ‘খিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড’ প্রবর্তন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। পরিবেশগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উত্তম চর্চার জন্য ৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০টি কলকারখানাকে ‘খিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড- ২০২০’ প্রদান করা হয়েছে। এই সম্মাননা প্রদান কার্যক্রমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রম পরিদর্শন ডিজিটলাইজেশন:

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ “লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন” (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। নিত্য প্রাণ্ড অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে এই অ্যাপকে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করার মাধ্যমে আরও ব্যবহার উপযোগী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কার্যক্রম:

কোভিড-১৯ সৃষ্ট অতিমারিতে সম্মুখ সারিতে থেকে দেশের শ্রমখাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনপূর্বক উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কাজ করেছে ডাইফ। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ চেকলিস্ট প্রণয়নপূর্বক শ্রমঘন এলাকার কারখানাগুলোতে ‘বিশেষ পরিদর্শন’ পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া “কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা” প্রণয়ন করে শ্রমঘন এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে শ্রমিক ও মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের শ্রমঘন এলাকায় ২,০০,০০০ (দুই লাখ) পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের চিকিৎসকগণের মাধ্যমে করোনাকালীন শ্রমিকদের মাঝে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষকে সচেষ্ট ও আন্তরিক হতে হবে। ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা মূল্যায়নপূর্বক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে তা সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনসহ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে গড়ে উঠবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

Workplace Safety in Bangladesh



George Faller

Chief Technical Advisor, ILO-Dhaka

Improving Working Conditions in the RMG Sector

Workplace safety in Bangladesh was placed under the spotlight in the aftermath of numerous workplace accidents a decade ago, culminating in hundreds of fatalities in the Tazreen fire and Rana Plaza building collapse incidents in 2012-13. Since then many initiatives have been undertaken to address different aspects of workplace safety, ranging from building safety initiatives, employer and worker training, establishment of workplace safety committees, to improvements in the effectiveness of the labour inspectorate in regulating safety aspects. What has become evident is that no one approach can address all the shortcomings in workplace safety, and that more emphasis needs to be placed on the coordination of efforts by a multitude of different agencies and participants.

Perhaps the first aspect that needs to be considered is the building itself, in which the work activity will take place. In Bangladesh the Ministry of Housing and Public Works (MoHPW) is the home of the Building Authority responsible for ensuring that all National Building Code (BNBC) safety requirements are incorporated into a building before a license to occupy the building is granted. Lack of enforcement of building code fire safety measures, compounded by negligent management practices, has been a major cause for the high number of fatalities due to building fires in the past and we are still witnessing the effects of that today. Building collapses, which are not so frequent but have the potential to cause catastrophic loss of life, are further indications of the failure to enforce the national building standards.

A large amount of resources have been dedicated over the past decade, both by private and government initiatives, in addressing the failure to enforce national building standards. The government agency on which most of the onus has fallen to remediate building safety defects is the Ministry of Labour and Employment (MoLE) and in particular the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE). Remediation of building code safety defects is not the typical work of a labour inspectorate, and a special temporary unit, the Remediation Coordination Cell (RCC) had to be set up under DIFE to take on this work. The experience of reviewing and monitoring the building remediation works will provide DIFE with a cohort of inspectors well equipped to identify building safety shortcomings in future,

but responsibilities for enforcement of building code requirements should not rest with DIFE.

Fire Services and Civil Defence (FSCD) under the Ministry of Home Affairs (MoHA) has an important role to play in ensuring safety in the workplace. A 'No Objection Certificate' (NOC) is required from FSCD in the construction stage and before an occupancy license can be granted. So they play a part in the enforcement of building code requirements prior to building in use, but their main role is that of fire prevention, extinction and rescue operations once the building is in use. Throughout the life occupancy of the building, FSCD carry out regular inspections as part of the Fire Licensing renewal process, in which they ensure that all the fire safety measures required by the occupancy certificate remain in place and in good operational condition, and that all occupants of the factory are familiar with the factory emergency action plan and have participated in practice drills.

The role of DIFE should start once the building has an occupancy license, first of all in reviewing the factory production processes and associated layout of plant and machinery, when granting the factory a license to operate. At this stage, DIFE should identify process and materials related risks and should ensure that appropriate precautionary measures are taken in the selection and layout of equipment and for the operation, transport and storage of materials. Their role does not end there; they are also responsible for the enforcement of many factory owner obligations under the Bangladesh Labour Act (BLA). DIFE's Labour Inspectorate carries out regular inspections of factories in which they identify and report on occupational safety and health (OSH) issues arising from the production activities in the factory. The labour inspectorate report on all work-related hazards, including biological hazards, use and handling of dangerous substances, ergonomic hazards, physical hazards, as well as on injuries and diseases arising from these hazards and preventative measures required to address them.

The data gathered by the Labour Inspection process is a valuable source for identifying the main recurring issues related to safety in the workplace, enabling these to be prioritised and special attention focused on them when monitoring the implementation of an OSH management system. Data on work related injuries and diseases can also be used to inform research and training needs for the National Occupational Safety and Health Training and Research Institute (NOSHTRI) being developed under DIFE.

The Inspectorate of Boilers under the Ministry of Industries (MoI) is another agency that needs to play its role in the promoting a safe and healthy work environment, through registration and licensing of boiler installations, and regular inspections to ensure adequate maintenance of the installation and replacement of boilers where necessary.

The employers have important responsibilities in ensuring a safe and healthy work environment for all occupants of a factory. Employers are required to ensure that all safety measures incorporated when obtaining occupation and regulatory approvals are kept in place and that related systems are maintained in good working order. Employers have a duty to coordinate, protect and promote the safety and health of all workers on site, and comply with the BLA and other relevant codes and guidelines as prescribed or approved under national legislation.

In consultation with the workers and their representatives, the employer should also identify hazards, make an assessment of the risks to the safety and health of workers arising from the production process and take all reasonable and practicable measures to eliminate them. It is the workers who are generally more exposed to the risks and therefore more attentive to potential hazards; their contribution is essential to bring these concerns to the attention of management to act on. To provide an official platform for

worker participation in the identification and amelioration of safety risks, the employer must ensure that there is an effective and functioning Safety Committee operating in the factory, with the required management and worker participation.

Chambers of Commerce such as FBCCI, other civil society organisations (CSOs) and employer associations can work in parallel with the regulatory authorities to exert an influence on enterprise owners. These groups do not have any statutory powers to enforce compliance, but can help build awareness on the business advantages in maintaining a safe workplace with effective participation and dispute resolution mechanisms in place.

Governments and employers have an obligation to provide safe and healthy working environments for all occupants of the premises housing the industrial production process, and workers have a complimentary role in collaborating on the implementation of adequate safety measures.

It is the work of the DIFE the Labour Inspectorate that is commonly associated with OSH, although as can be appreciated from the discussion above, it is but one aspect of a comprehensive national occupational safety management system. There are a multitude of players and agencies involved and for effective implementation of a national workplace safety management system, there needs to be a common understanding of who plays what role and where responsibilities lie. Roles and responsibilities must be set out clearly and unambiguously so that all players take responsibility for their areas, and when failures occur it should be clear what are root cause of those failures and the appropriate action should be instigated to address those failures at source.

The Labour Inspectorate should concentrate on its mandate for enforcement of OSH in operating factories and establishments, and other agencies should ensure that they are exercising their authority where their responsibilities lie and at the right time. Remediation of building safety shortcomings must be seen as a temporary and passing stage in the development of a safe working environment in Bangladesh, and all efforts must be made to rectify enforcement shortcomings so that belated major remediation works are no longer needed.

শোভন কর্মপরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা বিকেএমইএ'র কার্যক্রম



এ.কে.এম. সেলিম ওসমান, এমপি

বাংলাদেশ নীটওয়ারার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের পাশাপাশি তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি ও অর্জিত অবস্থান ধরে রাখার জন্য উৎপাদনশীলতাকে অন্যতম হাতিয়ার ও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হিসেবে পরিগণিত করে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এখন সময়ের দাবি। আশার আলো এই যে, ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার এর গুরুত্বকে অনুধাবন করে উৎপাদনশীলতাকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে রূপান্তরের জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন এনপিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এপিও এর সহযোগিতায় রচিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০ অন্তর্ভুক্ত করে যা সার্বিক উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে এবং একইসাথে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বিক উৎপাদনশীলতার হার ৩.৮% থেকে ৫.৬% এ উন্নীতকরণে ভূমিকা রাখবে। তবে, সময়োপযোগী এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি সেক্টরকে প্রয়োজন অনুপাতে আর্থিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সহায়তা করার জন্য সরকারকে এখনই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

বিকেএমইএ তার সৃষ্টিগ্ন থেকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে যা ক্রমশ নীট সেক্টরকে একটি স্থিতিশীল এবং ঈর্ষণীয় অবস্থানে উপনীত করেছে। উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা মানে শুধু শ্রমিকের উপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ নয় বরং বিভিন্ন নিয়ামকসমূহ যথা শোভন কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সৃজনশীল দক্ষতা, গবেষণা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নকরত বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা।

প্রতিটি শিল্পের জন্য মানব শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর এ সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং উত্তম পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। বিশেষজ্ঞদের মতে, শোভন কর্মপরিবেশ হচ্ছে শারীরিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত আচরণ, প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার সমন্বিত রূপ। যেখানে একজন শ্রমিক নিজেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং তার বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ অটুট থাকে। শোভন কর্মপরিবেশ শ্রমিকের জন্য প্রেষণা হিসেবে কাজ করে যা কাজের প্রতি তার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে উদ্বীপক হিসেবে কাজ করে। ফলশ্রুতিতে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, শোভন কর্মপরিবেশের অনুপস্থিতিতে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, অভিযোগ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনুপস্থিতি বা কর্মসংস্থান পরিবর্তনের হার বৃদ্ধি পায়। এমনকি পুঞ্জিভূত অসন্তুষ্টি থেকে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে যা স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করতে পারে। এমনটি মোটেও কাম্য নয়। তাই, স্বাভাবিক ও শিল্পবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির স্বার্থে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই।

শোভন কর্মপরিবেশ তথা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক একটি নিরাপদ ও শ্রমিকবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিকেএমইএ'র ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, বহুমাত্রিক সৃজনশীল স্বীয়

উদ্যোগ এবং একইসাথে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা দেশে বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৬ সালে বিকেএমইএ কর্তৃক গঠিত সোশ্যাল কমপ্রায়সেস সেলের একটি অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে সদস্য কারখানাগুলোতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। নীট শিল্পের ধারাবাহিক উন্নয়ন ও পরিকল্পিত সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে।

বিকেএমইএ এবং ILO এর যৌথ উদ্যোগে "Improving The Working Condition In RMG Sector" প্রোগ্রাম এর আওতায় "Essentials of Occupational Safety and Health (EOSH)" নামক প্রকল্পটি অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বিকেএমইএ কারখানা পর্যায়ে ৩৫৩৮ জন মিড-লেভেল কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে OSH Expert হিসেবে তৈরী করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কারখানার শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপত্তা সচেতনতা, অগ্নি নিরাপত্তা, পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার, আরগোনোমিক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কারখানা পর্যায়ে ৩,৫০,০০০ জনের বেশি শ্রমিক এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় যা কারখানাতে অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ বিষয়ক সচেতনতাকে একটি অভ্যাসে পরিণত করে এবং যা বাস্তবায়নে আমরা শতভাগ সফলতা অর্জন করেছি।

"ILO BKMEA Joint Industry Response amid on COVID-19 in the RMG Sector of Bangladesh" নামক চলমান প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক ৭৩টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৫৬টি সদস্য কারখানার অধীন ১৮৬৮ জন বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

Sl	Training Title	Batch	Participant
1	COVID-19 Awareness	22	620
2	OSH and Infectious Diseases Preparedness & Response	28	748
3	Supervisory Skills (SS)	02	60
4	Best HR Practices (HR)	02	60
5	Collective Bargaining	02	40
6	Grievance Handling	17	340
Total		73	1868

তথ্যসূত্র : Report on "ILO BKMEA Joint Industry Response amid on COVID-19 in the RMG Sector of Bangladesh Project"

বিকেএমইএ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং মেরী স্টোপস এর সহায়তায় ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমোডিটিজ সাপ্লাই ইন আরএমজি সেক্টর প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হল কারখানায় কর্মরত বিবাহিত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ফলশ্রুতিতে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণমুখী নীট শিল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। বাংলাদেশের তেরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ নারী শ্রমিক। কর্মজীবী এসব বিবাহিত নারী শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুবিধা যেমন: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মেনুস্ট্রেশন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের নিত্যদিনের ব্যস্ততায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মজীবী শ্রমিকেরা উল্লিখিত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। সুবিধা বঞ্চিত এ বিশাল শ্রমগোষ্ঠী যেন তার কারখানা থেকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিকেএমইএ এবং কানাডিয়ান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নিউট্রিশান ইন্টারন্যাশনাল যৌথ অর্থায়নে সদস্য কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে "নিউট্রিশান অব ওয়ার্কিং ওম্যান" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত কারখানাগুলোর সকল শ্রমিকদেরকে পুষ্টিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং মহিলা শ্রমিকদের সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্ট প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের নীটওয়ারার সেক্টরে প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছে তন্মধ্যে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০১৪ এর তথ্যানুসারে, ৪২.৪ শতাংশ এর বেশি প্রজননক্ষম মহিলা রক্তস্বল্পতাজনিত রোগে ভুগছে।

১৫-৪৫ বছর বয়সী ২৪ শতাংশ মহিলা কম ওজন সম্পন্ন। ফলশ্রুতিতে তারা অল্প শারীরিক শ্রমেই ক্লান্ত হয়ে যায়। এই সময়ে মহিলাদের শরীরের আয়রনের ঘাটতি পূরণে তাদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে আয়রন ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্ট প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সফলভাবে ২৬ জন মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষিত হয় এবং কারখানা পর্যায়ে মোট ৬৩৭ (নারী-২৫৪জন, পুরুষ-৩৮৩ জন) জন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নিউট্রিশন বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়। অতঃপর কারখানা পর্যায়ে ২ লক্ষ ১০ হাজার শ্রমিককে নিউট্রিশন বিষয়ে ৩ ঘণ্টার অরিয়েন্টেশন সেশন প্রদান করা হয়। ৬৪১৭ জন গর্ভবতী নারী শ্রমিকসহ মোট ১৮০,০০০ জন নারী শ্রমিককে আয়রন ও ফলিক এসিড সরবরাহ করা হয়।

যক্ষ্মা মুক্ত নিউ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া তথা সুস্থ কর্মপরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে বিকেএমইএ ২০১৩ সালে নারায়ণগঞ্জস্থ বিসিক শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত বিকেএমইএ হেলথ কেয়ার সেন্টারের ৩য় তলায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। যেখানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। নারায়ণগঞ্জস্থ বিসিক শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ছোট, মাঝারি ও বড় আকারের মোট ৪০০টি নিউওয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট ১২০,১৩৫ জন শ্রমিক এই প্রকল্পের আওতাধীন। যক্ষ্মা রোগের ভয়াবহতা ও প্রতিকারে করণীয় কী তা এই প্রকল্পের মাধ্যমের মালিক, মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিকদেরকে অবহিতকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও ক্রমাগত ২ সপ্তাহের অধিক কাশি থাকলে ঐ সকল শ্রমিকদের কফ সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক সেবার মাধ্যমে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা হয়। বিকেএমইএ'র যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পটি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এর অর্থায়নে ও বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে।

বিকেএমইএ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে ২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে সদস্য কারখানায় “কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল” কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এই পর্যন্ত মোট ২৩৬টি কারখানায় ৫৯,৬৯৬ জন মহিলা শ্রমিক (যারা শিশু সন্তানদেরকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন অথবা গর্ভবতী) তাদেরকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে বর্তমানে একজন উপকারভোগী তিন বছরের জন্য মাসিক ৮০০/- টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। কর্মসূচির আওতায় শ্রমিকদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিরাপদ মাতৃত্ব, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ, সন্তানকে শিক্ষাদান, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, এবং ০ থেকে ৫ বছরের শিশুর মানসিক বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিকেএমইএ এবং Pathfinder International যৌথভাবে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা” শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুস্বাক্ষর করে যা বিকেএমইএ টাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত ৫০০টি নিউওয়ার কারখানায় নিয়োজিত নারী এবং পুরুষ শ্রমিকদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, HIV দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে। তৈরি পোশাক খাতে মোট শ্রমিকের প্রায় ৬০ শতাংশ নারী শ্রমিক এবং একটা বিশেষ অংশ প্রজনন বয়সের গড় বয়স যথাক্রমে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নারী পুরুষ শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য সদস্যভুক্ত কারখানার কর্মকর্তা এবং বিকেএমইএ এর মোট ৫৮ জন কর্মকর্তা মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষিত হয়ে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে।

উৎপাদনশীলতা শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। উৎপাদনশীলতার সুসম বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার তথা সর্বাধুনিক মেশিন স্থাপন ও আধুনিকায়নের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে সাধারণত উন্নত প্রযুক্তি খুব স্বল্প হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রথাকে ভেঙে দিয়ে উৎপাদনশীলতাকে দ্বিগুণিত লক্ষ্যে উপনীত করার জন্য গতানুগতিক প্রযুক্তি ও মেশিন ব্যবহারের পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তথা সর্বাধুনিক মেশিন ব্যবহারের জন্য বিকেএমইএ সদস্য কারখানাগুলোকে উৎসাহ প্রদান করে আসছে।

পরিশেষে, শ্রমিকরা যেহেতু কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে, সেজন্য তাদের পারিবারিক জীবন এবং কর্মজীবনের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনয়ন করা প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এতে করে প্রত্যেক শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি নির্বিঘ্ন হবে। বিকেএমইএ একজন কর্মীকে শুধুমাত্র শ্রমিক সত্ত্বার মধ্যে শৃঙ্খলিত করতে চায় না বরং আইনগত অধিকারের পাশাপাশি তার সকল মানবাধিকার সংরক্ষণেও অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চায়। তাছাড়া, তার প্রত্যেকটি ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ, শ্রমিক সন্তুষ্ট থাকলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পাবে জিডিপি যা অর্থনীতি তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে সচল রাখবে।

পোশাক শিল্পে শোভন কর্মপরিবেশের অগ্রযাত্রা



ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ

২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২৮ এপ্রিল দিনটিকে বিশ্বব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। বাংলাদেশও ২০১৬ সাল থেকে দিবসটি উদযাপন করে আসছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের এই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস’ কেবল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা সরাসরি সম্পৃক্ত। টেকসই শিল্প গড়ে তুলতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পে শ্রমিক, মালিকসহ সর্বাঙ্গীণ সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা প্রতিটি উদ্যোক্তা বিশ্বাস করি যে, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র কর্মীর অন্যতম মৌলিক অধিকার। তাই, কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বিপদ এবং ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার বিষয়কে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে সদস্য কারখানাগুলোকে নিয়মিত নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। সেইসাথে নতুন সদস্য কারখানা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার বিষয়টিও কঠোরভাবে দেখা হচ্ছে।

বিজিএমইএ এর উদ্যোগে Essential of Occupational Safety & Health (EOSH) কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি কারখানার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, বিভিন্ন কমিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান রয়েছে।

সদস্য কারখানাগুলোতে নিয়মিতভাবে অগ্নি নিরাপত্তা, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে এবং ২০১৪ সাল থেকে শিল্পে অগ্নি-দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এবং গুরুতর জখমের কারণে শ্রমিকের মৃত্যু হলে এবং স্থায়ীভাবে কর্ম-অক্ষম হলে পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাইবোন ইআইএস (EIS) প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘ মেয়াদি আর্থিক সহায়তা পাবেন। বিজিএমইএ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএলও এবং জার্মান সরকার (GIZ) এর যৌথ উদ্যোগে Employment Injury Scheme (EIS) নামক পাইলট প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর আলোকে অধিকাংশ পোশাক কারখানায় অংশগ্রহণ কমিটি ও সেইফটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কারখানাগুলোতে বিভিন্ন কমিটির সক্ষমতা বাড়াতে বিজিএমইএ ও জার্মান সরকারের যৌথ উদ্যোগে Sustainability in the Textile and Leather Sector in Bangladesh (STILE) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল পোশাক শ্রমিক কর্মচারীকে মহামারি কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত দ্রুততার সাথে টিকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিক ভাই বোনদের কল্যাণে বিজিএমইএ আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রামে ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে একটি হাসপাতালের মাধ্যমে শ্রমিক ভাইবোনদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব থেকে প্রতিমাসে প্রায় ১১ হাজার শ্রমিক ভাইবোন স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছেন।

রপ্তানির বিপরীতে উদ্যোক্তারা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থ জমা দিচ্ছেন, যেখান থেকে শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিগত এক দশকে তৈরি পোশাকখাতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, টেকসই উন্নয়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। পোশাকখাতের এই বদলে যাওয়ার কথা শুধু খাত সংশ্লিষ্টগণই নন, বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিয়েছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ আর পোশাক কারখানা আজ সমার্থক শব্দ। হংকংভিত্তিক কিমা'র সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ইথিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পোশাক শিল্পে সবুজ শিল্পায়নে এক নীরব বিপ্লব ঘটেছে। ইউএসজিবিসি (ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল) থেকে প্রত্যয়নকৃত সর্বোচ্চ সংখ্যক সবুজ কারখানার আবাসস্থল এখন বাংলাদেশ। বর্তমানে আমাদের ১৫৭টি ইউএসজিবিসি সনদপ্রাপ্ত। এগুলোর মধ্যে ৪৭টি প্লাটিনাম রেটেড এবং আরও ৫০০টিরও অধিক কারখানা সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। বিজিএমইএ জলবায়ু বিষয়ে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি চার্টার এবং জাতিসংঘ গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উদ্যোগেও যুক্ত হয়েছে।

শিল্পের এসব অর্জনের জন্যই ডিজনির মতো একটি ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে সোর্সিং বন্ধ করার পর আবার সোর্সিং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পুনর্বহাল করেছে। শিল্পের এই অর্জনগুলো আগামী দিনগুলোতে ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিল্পের এই অভূতপূর্ব অর্জনে উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সরকার, ব্র্যান্ড/ক্রেতা, উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীদার সকলেরই অবদান রয়েছে।

আমরা কৃতজ্ঞ যে বর্তমান ব্যবসা ও শ্রমিকবান্ধব সরকার শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য শোভন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিসহ তাদের সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছে। এছাড়াও সরকার 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাজশাহীতে OSH ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। আইএলও এর সহযোগিতায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানে কারখানায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

একটি ব্র্যান্ড বা রিটেইলার এর ধারণায় সর্বোচ্চ নিরাপদ শিল্পের সংজ্ঞা যা হতে পারে, আমরা শিল্পকে সে পর্যায়েই আনতে সক্ষম হয়েছি। আজ আমাদের প্রতিটি পোশাক প্রতিষ্ঠান, এমনকি সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিও জানে নিরাপত্তার কোনও বিকল্প নেই; বিধি-বিধান প্রতিপালন ও শিল্পের উন্নয়নের কোনও বিকল্প নেই। শিল্পের জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে।

শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষার বিষয়টি একটি মাল্টি-সেক্টরাল ইস্যু, যেখানে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের দায়িত্ব রয়েছে। একেকটি কারখানায় ৫-৩০ কোটি টাকা বাড়তি বিনিয়োগ করে নিরাপদ করা হয়েছে। অথচ ক্রেতার দাম বাড়াচ্ছেন না। পোশাক শিল্পে চলমান উদ্যোগকে নিশ্চিত করার জন্য ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা এবং ক্রেতা ও ভোক্তাদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

পরিশেষে, কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী। শ্রমিকদের সুস্থতা ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার সাথে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অতি সম্প্রতি সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রকাশ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পোশাক শিল্প সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করবে। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে শিল্প আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, এটাই কাম্য।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির উন্নয়নে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ভূমিকা



আরদাশীর কবির
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাংলাদেশ এক সময় কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে ক্রমশ বেরিয়ে এসে শিল্প ও সেবা খাতমুখী হচ্ছে। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যালোচনা করেছিল বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিএনপি) কৃষি খাতের অবদান ছিল ৫৯.৪ শতাংশ। আর শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে মাত্র ৬.৬ শতাংশ ও ৩৪ শতাংশ। বর্তমানে দেশে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। বিশেষ করে ৮০'র দশকে একটি বিশেষ শিল্পখাতের (তৈরী পোশাক) বিকাশের মাধ্যমে দেশ শিল্পমুখী অর্থযাত্রার দিকে একধাপ এগিয়ে যায়। একটি দেশকে উন্নত হতে হলে শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। এক সময় পাটশিল্পের জন্য আমাদের দেশকে বলা হতো সোনালী আঁশের দেশ। যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে আমরা সেই পাটশিল্পকে রক্ষা করতে পারিনি। সুতরাং শিল্পায়নকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা।

তৈরী পোশাক খাতের অগ্রগতির মাধ্যমে দেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক প্রাণ হারানোর দেশে-বিদেশে তৈরী পোশাক খাত তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইসাথে সরকার, মালিক-শ্রমিকসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল উপলব্ধি করে যে, বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো না। বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রশ্রবদ্ধ হয়ে পড়ে। ওই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সাসটেইন্যাবল কমপ্যাক্টের মাধ্যমে গঠিত হয় অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) এবং অ্যালায়েন্স ফর ওয়ার্কার সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যালায়েন্স)। অ্যাকর্ড মূলত ইউরোপের ক্রেতাদের জোট। প্রায় ২০০ ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান এবং বৈশ্বিক ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাকর্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিবদ্ধ ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের পোশাক তৈরির কাজ করে এমন ১৬০০ কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে অ্যাকর্ড। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোটের নাম অ্যালায়েন্স ফর ওয়ার্কার সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যালায়েন্স)। বিশ্বখ্যাত পোশাক ব্র্যান্ড ওয়ালমার্ট ও গ্যাপসহ ১৭টি প্রতিষ্ঠান জোটবদ্ধ হয় অ্যালায়েন্সের সাথে। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স উভয়েই দীর্ঘ সময় ধরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানার সেইফটি বিষয়টি দেখভাল করে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তত্ত্বাবধানে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশও তাদের কাজ চালিয়ে যায়। সকল ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে মালিকপক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন।

সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১৩ সালে দ্রুততম সময়ের মধ্যে (মাত্র তিন মাসের মধ্যে) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ ৮৭টি জায়গায় সংশোধন করে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো যুগোপযোগী করে। সরকার ওই বছরের ০৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটির গুরুত্ব, অংশীজনদের (সরকার, মালিক, শ্রমিক, মালিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন) ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করে। শ্রম আইনকে বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় বিধিমালা হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এই আইন সংশোধন ও নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়নে মালিকপক্ষের হয়ে

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালেও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ আবারো সংশোধন করা হয়। ২০১৮ সালের আইনের সংশোধনী অনুযায়ী শ্রম বিধিমালা সংশোধনের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। খুব শীঘ্রই সেটি আলোর মুখ দেখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কলকারখানা পরিদর্শনকে গুরুত্ব দিয়ে সময়ের চাহিদায় মাত্র নয় মাসের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তর করা হয় এবং বিপুল সংখ্যক লোকবল দিয়ে অধিদপ্তরকে আধুনিকায়ন করা হয়। কারখানার কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শ্রমিকের অধিকার আদায়ে সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কলকারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ডিজিটালকরণের জন্য লেবার ইমপেকশন ম্যানেজমেন্ট এপ্লিকেশন (লিমা) অ্যাপ চালু করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং পেশাগত রোগ শনাক্তকরণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক গবেষণার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ বিষয়ে মালিকদের আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন সেক্টরের কারখানাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার ও গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছে। এছাড়াও শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে সমুল্লত করতে শ্রম পরিদপ্তরকে আধুনিকায়ন করে শ্রম অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকবল বৃদ্ধি করা হয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বিষয়েও বিশাল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ইতালির তুরিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর ১১৪ জন সিনিয়র মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসব সিনিয়র মাস্টার ট্রেইনার ৫৮৫টি কারখানার ৮ হাজার ৩৮ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কারখানার সুপারভাইজারদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রের মোট ৮ লাখের বেশি শ্রমিককে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও ACTEMP এবং জাপানের AOTS এর সহযোগিতায় বিইএফ নিয়মিতভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের সরকার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল থেকে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের স্বজনদের দুই লাখ, দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা এবং শ্রমিকের সন্তানের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে সর্বোচ্চ তিন লাখ এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত গার্মেন্টস শ্রমিকদের চিকিৎসায় দুই লাখ এবং তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশন (বিইএফ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে এই নিবন্ধ শেষ করতে চাই। বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশন দেশের মালিকদের জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র ফেডারেশন। দেশের প্রধান প্রধান শিল্পখাতসমূহের এসোসিয়েশন এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বড় বড় প্রতিষ্ঠান এর সদস্য। বিইএফ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিইএফ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মালিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন International Organisation of Employers, Geneva (IOE) এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে মালিকদের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে থাকে। তাছাড়া প্রতিবছর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন, Sustainability Compact, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি এবং অন্যান্য সামাজিক নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়ে ফেডারেশন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এছাড়াও শ্রম আদালতে মালিকপক্ষের সদস্য মনোনয়নে বিইএফ কাজ করে থাকে।

গণমানুষের সুরক্ষায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন

এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানা কারণে আমাদের দেশ ক্রমান্বয়ে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অরক্ষিত স্থানে পরিণত হয়ে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙন, টর্নেডো ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। ঘনবসতি, অপরিচালিত নগরায়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ দালান কোঠা নির্মাণের ফলে শহর ও নগর এলাকায় ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়া দানকারী সেবা বাহিনী হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আমাদের সাফল্য থাকলেও প্রতিনিয়ত নতুন হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। দেশে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমানহারে বহুতল/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবিলায় এ অধিদপ্তরের পুনর্গঠনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখী কার্যক্রম। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে শিল্প কারখানায় কর্মরত সকলের নিরাপত্তা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপত্তা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। শুধু সরকারি উদ্যোগে সকলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগতকাজে নিয়োজিতদের জন্য শতভাগ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা দুরূহ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২২ উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হলো যেকোনো মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সংখ্যা সহনীয় ও গ্রহণীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা। একই সঙ্গে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এরই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের যুগান্তকারী ঘোষণা দিয়েছেন। সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে আছি আমরা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সারা দেশে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ছিল ২০৬টি, বর্তমানে চালুকৃত ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৫৬টি। প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে ফায়ার স্টেশনের মোট সংখ্যা হবে ৫৬৫টি। আমাদের সামর্থ্যের সর্বটুকু কাজে লাগিয়ে জাতির জন্য সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা বিধান করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার

সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এখন বহুমাত্রিক সেবাকাজে নিয়োজিত। বর্তমান সরকার আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমাদের সেবার মান ও সামর্থ্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি আমাদের সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। আমরা এখন অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ, নৌযান দুর্ঘটনায় ডুবুরি কর্তৃক উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান, হাইওয়েসহ দেশের ৯২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দ্রুত সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রবর্তী অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী দল মোতায়েন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অগ্নি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় প্রদর্শনী ও মেলাসমূহে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করে আসছি। আমরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরতদের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। এছাড়া অন্য সকল পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমরা ভূমিকম্প বা মেগা ডিজাস্টার মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সারা দেশে ৬২ হাজার আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ৪৮,৮৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এদের ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে তাদের জন্য উদ্ধার সরঞ্জাম মজুদ রাখা হয়েছে। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফায়ার সায়েন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ফায়ার সেইফটি ম্যানেজার কোর্স চালু করেছে। এ পর্যন্ত ১০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় ফায়ার সেইফটি ম্যানেজার কোর্সে ৯৯১ জন এবং ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেইফটি কোর্সে ১১২৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ফায়ার সায়েন্স চলতি বছরেই শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের মান অক্ষুণ্ন রাখতে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রাস্তিক পর্যায় পর্যন্ত সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিটি ফায়ার স্টেশনকে এক একটি ডিজাস্টার রেসপন্স ক্লাবে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে অত্র অধিদপ্তরের। পেশাগত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)-এর গাইডলাইন অনুসারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে আন্তর্জাতিক মানের Urban Search & Rescue Team (USAR Team) গঠন করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বছরব্যাপী অগ্নি প্রতিরোধসহ দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, কলকারখানা, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বস্তি এলাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে নিয়মিত পরিদর্শন, গণসংযোগ, মহড়া অনুশীলন ও পরামর্শ প্রদান; অগ্নি নিরাপত্তার শর্তে বহুতল ভবনের ছাড়পত্র প্রদান; জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হাট-বাজার, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, গণসংযোগ, মাইকিংসহ নানা ধরনের কর্মসূচি পালন; ওয়ারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূর্বক ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা; দেশের কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশনসহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা; ফায়ার স্টেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত SOD (Standing Order on Disaster) অনুসারে অন্যান্য বাহিনীর সমন্বয়ে নিয়মিত যৌথ মহড়া ও অনুশীলনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে।

আমরা সকলে জানি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ছোঁয়া দৃশ্যমান যা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অগ্নিকণ্ডের পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যাবে যেখানেই একটি দেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ধাবিত হয় তখন এর সাথে সাথে নতুন নতুন অগ্নি ঝুঁকি যেমন : জীবনযাত্রায় উচ্চ দাহ্যবস্তুর ব্যবহার, ইন্ট্রিরিয়র ডেকোরেশনে ঝুঁকিপূর্ণ উচ্চ দাহ্যবস্তুর ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ এবং অননুমোদিত বহুতল ভবন নির্মাণ, অপরিষ্কৃত নগরায়ন, অপরিষ্কৃত শিল্পায়ন, অপ্রশিক্ষিত কর্মী দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যালের অনিরাপদ ব্যবহার, আবাসিক এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল ও শিল্প কারখানার অবস্থান, মিস্ত্রি অকুপেশনী ভবনের আধিক্য, অনিরাপদ ও অননুমোদিত ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার, অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যামসহ অনেক ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকিসমূহ মানুষের জীবনযাত্রার সাথে যুক্ত হতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজন যথোপযুক্ত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা। আমরা বিশ্বাস করি অগ্নি প্রতিরোধ নির্বাপণের চেয়ে উত্তম। তাই সময় এসেছে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা, অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতা, প্রশিক্ষণ, মহড়া, নিয়মিত পরিদর্শন, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থাদির রক্ষণাবেক্ষণ, স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধির জনসংযোগ ও তদারকি এবং সর্বোপরি অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সামাজিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Embassy of Denmark: OSH in Bangladesh is the foundation for sustained growth



SØREN ALBERTSEN
SECTOR COUNSELLOR
ROYAL DANISH EMBASSY

The Embassy of Denmark supports safe, healthy and harmonious workplaces as the key to creating a stable Labour Market. A stable Labour Market is considered a pre-condition for stability and growth.

Denmark is supporting a number of projects in the sustainability area and on this occasion, one should be highlighted: the capacity building Government to Government cooperation (SSC) between the Ministry of Labour and Employment in Bangladesh & the Ministry of Employment in Denmark. DWEA (the Danish Labour Inspection) handles the implementation in close cooperation with the Danish Embassy and DIFE.

One of the key strengths of the SSC project is the direct cooperation between staff in similar organisations (the National Labour Inspections). The effect of this common ground and common work sphere creates a good starting point for learning and exchange. The turning point was originally the education of “Master trainers” on 7 different topics. Many activities have been initiated thanks to these master trainers: DIFE2DIFE training (training of peers), National Guidelines on Labour Inspection, Targeted Inspections, Creation of Curricula for NOHSTRI (National OSH Institute in Rajshahi) and as a side effect: long (2 year masters) or short trainings (OSH, Management, High-level exposure) in Denmark.

During 2021, Covid-19 has again severely hampered the implementation of the project, but in 2021, 5 Masters’ Students from DIFE have started their studies in Danish Universities and support to NOSHTRI has been ongoing and continues in 2022.

Apart from the SSC project, Denmark is supporting “Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations”, SDIR, which is being implemented by ILO. It aims at creating tools, institutions and understanding that support negotiation as a means of conflict resolution and it builds on the tripartite system that enables the three parties: employer’s organisations–unions and government to maintain a constructive social dialogue to find common solutions in a win-win-win scenario.

The three main objectives of SDIR are: 1. Improved social dialogue and grievance handling, 2. Mechanisms for conciliation and arbitration and 3. Organisational capacity to prevent and resolve disputes.

The project “Network to Integrate Productivity and Occupational Safety and Health improvements” (NIPOSH) is implemented jointly by AUST and BGMEA with University of Southern Denmark as an external consultant. It covers:

Recruitment and selection of 20-30 RMG factories for a network. These factories were then being instructed and frequently guided to introduce LEAN management with a strong OSH component in their production. By the end of 2022, results in terms of both productivity and OSH improvements will be measured and communicated. As a side effect, BGMEA staff is following the process in order to be able to take over some or all of this kind of activity from 2022.

On top of the above mentioned projects, Denmark is also supporting a number of research studies in Bangladesh in cooperation between Danish research institutions and Bangladeshi Universities.

The Return of Investment (ROI) of Positive Safety Culture



Gholam Muktadir

Labour Inspection Officer
Strengthening Labour Inspection System of Bangladesh
Including Gender, Communication, Knowledge
Management and OSH- Project

A positive safety culture encompasses the expectations, feelings, and perspectives of employees toward the occupational safety and health of all workers in an organization. It is how occupational safety and health is managed in the workplace. Of course, taking a proactive approach to build a positive safety culture will have a large impact on your organization.

Smart Business Strategy- There is a proverb, prevention is better than cure. The good news is that creating a great workplace safety culture at your organization will bring about a positive business return. A safe business is a well-run and sustainable business.

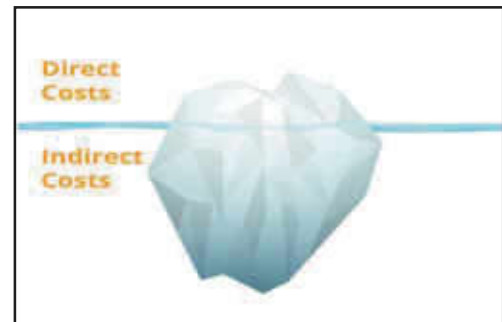


Figure: True cost of Accident (Iceberg Model)

Safety Culture Will Contain Costs- Now-a-days workers compensation and health care costs are spiraling out of control. Smart organizations proactively contain these costs to improve their bottom line with results-based safety and welfare programs. A positive safety culture can lower all kinds of direct and indirect cost such as staff turnover, reduce absenteeism, lower training costs, decrease workplace accidents, reduce possible insurance claims and regulatory bodies fines etc. and have a positive effect on your company's brand value.

Safety Culture Will Increase Productivity- In general, a happier group of employees will be more productive and produce higher quality work. Unfortunately, sometimes just doing the core activity is not always enough to reach the business goal. Safe and motivated, happy workers are more productive workers in any organization. Absenteeism cost due to work related injury and disease lead to billions in lost productivity each year in the companies. Smart companies contain this cost and boost performance with sensible, results-based safety and health initiatives.

Safety Culture Will Produce A Higher Quality Product – When a worker is experiencing injury and mental discomfort due to unsafe work environment, their mind is on their injury and mental discomfort. Not what they are supposed to be concentrating on, the product they are involved in producing.

Safety Culture Leads To Higher Job Satisfaction And A Competitive Advantage In People – Those companies that show a commitment to the health and safety of workers and their families earn the trust and admiration of employees, leading to high job satisfaction. A lots of research show that high job satisfaction leads to better work productivity.

Smart Companies will lead the Industry 4.0 revolution - By creating positive safety culture ultimately you can achieved your company's goal. Safety culture is good for your people and company. It has to be viewed and presented to the top management as an investment which has a return of investment (ROI) value, not an expense.

Your people are your greatest asset – take care of them and empower them to flourish at your company. Hence, a positive safety culture is something that's worth being proactive about.

গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং টেকসই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি



মো: আলম হোসেন,
পরিচালক, লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি
ওশি ফাউন্ডেশন

শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে আনুমানিক ৮৭% শ্রমশক্তি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নিযুক্ত। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এর সংখ্যা বেশি। নারীদের অনানুষ্ঠানিক কাজে নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনাও বেশি। ২০১০ সালে বাংলাদেশের মোট মূল্য সংযোজনের ৪০% এরও বেশি আসে অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে কৃষি, মৎস্য, বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র শিল্পের যেখানে মূলধন তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যারা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কাজ করে তাদের মধ্যে রয়েছে মজুরি শ্রমিক, স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি, অবৈতনিক পারিবারিক শ্রম, পিস রেট শ্রমিক এবং অন্যান্য ভাড়াটে শ্রমিক।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি মৌলিক মানবাধিকার। সে হোক প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টির মূলত দু'টি দিক: একটি হলো-সর্বাঙ্গীণ শরীর ও মনকে সকল প্রকার রোগ-বলাই থেকে মুক্ত রাখা এবং অন্যটি হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন করে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা, অকস্মাৎ মৃত্যু, অপমৃত্যু, অঙ্গহানি, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সার্বজনীন শ্রমমান নির্ধারণের লক্ষ্যে আইএলও এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ১৮৭টি কনভেনশন এবং ১৯৯টি রিকমেন্ডেশন প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে ১৬টি কনভেনশন এবং ২২টি রিকমেন্ডেশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত। আইএলও এর সর্বশেষ প্রণীত কনভেনশনটিও (সি-১৮৭) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কত গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সংবলিত ৭টি কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে এবং সে অনুযায়ী শ্রমনীতি, শ্রম আইন, শ্রমবিধি, শিশুশ্রম নিরসন নীতি, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে যার যুগোপযোগীকরণ কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত এসকল নীতি ও আইনের প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে পরিচালিত কার্যক্রমের বেশিরভাগ পোশাক খাতের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কর্মস্থলে সীমাবদ্ধ। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত বিপুল পরিমাণ শ্রমিক রয়ে যায় পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার বাইরে। এতে তারা একদিকে যেমন তাদের মৌলিক অধিকার পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাবে বিভিন্নরকম রোগ-ব্যাদিতে ভুগে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলছে যা আমাদের অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জাতীয় পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শোভন কাজ, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ২০১১ সালে লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক যেমন- নির্মাণ শ্রমিক, গৃহভিত্তিক

শ্রমিক, ইটভাটা শ্রমিক, ওয়েস্ট পিকার, চাতাল শ্রমিক, হকার, গৃহকর্মী ও কৃষি শ্রমিকদের মাঝে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এর পাশাপাশি লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য নীতিমালা তৈরির নিমিত্ত সরকারি নীতি নির্ধারকদের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন যা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বিগত বছরগুলোতে লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রান্তিক শ্রমিক বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় আনার জন্য সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও দক্ষতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া নারী শ্রমিকদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বের উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, মানসিক স্বাস্থ্য, করোনাভাইরাস মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। উপর্যুক্ত কার্যক্রমের ফলে ওয়েস্ট পিকার, কৃষি শ্রমিক ও গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা সমবায় অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত ১০টি সমিতির নিবন্ধন নিতে সক্ষম হয় যার মাধ্যমে তারা ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস মহামারিতেও লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে তাদের রক্ষার জন্য সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন প্রচার প্রচারণামূলক উপকরণের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণসহ জ্রাণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারে সেজন্য কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেন। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা উপকরণ যেমন: পোস্টার, লিফলেট, ফ্লাইয়ার, বুকলেট ও স্টিকার মুদ্রণ ও বিতরণ করেন। তদুপরি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে এসকল শ্রমিকদের সম্ভাবনা, সুযোগ ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা, সভা, সেমিনার ও সামাজিক সংলাপেরও আয়োজন করা হয়।



এখানে উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত উপকারভোগীর একটি বিরাট অংশ গৃহভিত্তিক শ্রমিক। ফলে স্বভাবতই লেবার অ্যাট ইনফরমাল ইকোনমি এর অধিকাংশ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের ঘিরে। গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বের উন্নয়ন, গৃহে তৈরি পণ্যের বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি, আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম তৈরিতে সহায়তা প্রদান, উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়ন তথা শোভন কর্মপরিবেশ তৈরি ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক কাজ করেন। এর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের যৌন ও পারিবারিক সহিংসতা নিরসন, সামাজিক সুরক্ষায় প্রবেশাধিকার, প্রজনন ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানসহ একাধিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন যা সরাসরি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুসারে দেশে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সংখ্যা আনুমানিক ২০ লক্ষেরও অধিক। ২০১৬-২০১৭ শ্রমশক্তি সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন অকৃষি এবং ৭.৪ মিলিয়ন কৃষি সংক্রান্ত গৃহভিত্তিক শ্রমিক ছিল। এটি যথাক্রমে ১৫ এবং তার বেশি বয়সী প্রায় ৫.২ এবং ১২.১ শতাংশ কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশের অসংখ্য নারী ঘরের এক কোণায় বসে সুঁই আর সুতো দিয়ে নিরলস বুনে চলছে নকশী কাঁথা, করছে কারচুপি ও বাহারি কারুপণ্যের কাজ কিংবা বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি করছে ঘর সাজানোর দরকারি সামগ্রী। মূলত এরা গৃহভিত্তিক শ্রমিক। এই খাতটি

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম উৎস। এ তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন সাপ্লাই চেইনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের তৈরি পণ্য দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার তথা আন্তর্জাতিক বাজারে খুবই সমাদৃত যা ঘর থেকে শুরু করে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিনিয়ত অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে, গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তারা স্ব-নিয়োজিত বা উপ-চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে তাদের বাড়ির ভিতরে বা কাছাকাছি কাজ করে। তারা সাধারণত জনসাধারণ ও নীতিনির্ধারকদের কাছে অদৃশ্য থাকে। তারা গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের সর্বনিম্ন স্তরে কাজ করে এবং পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে ঠিকাদার এবং উপ-ঠিকাদারদের দ্বারা শোষিত হয়। বাংলাদেশে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে কোনো সুরক্ষা নেই বললেই চলে এবং যেহেতু তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক সেহেতু পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান তাদের ক্ষেত্রে মানা হয় না।



বাংলাদেশে, বিশেষত শহরাঞ্চলে কর্মরত বেশিরভাগ গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বা বস্তিতে বসবাস করে। এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে কোনো মৌলিক অবকাঠামোগত সেবার সুযোগ সুবিধা নেই। এসব বসতিগুলোতে অধিকাংশ শ্রমিক (৩২.৯৮%) অপরিষ্কার বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ, যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধার অভাব এবং জলাবদ্ধতাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হন। তারা খুপরি মতো একটি ছোট কক্ষ বা গৃহে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করেন যেখানে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও আলো বাতাসের অভাব রয়েছে। একটি সংকীর্ণ আবদ্ধ জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে তারা নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন-শ্বাসকষ্ট, উচ্চ রক্তচাপ ও মাথাব্যথা, প্রজনন সমস্যা, মূত্রথলির সংক্রমণ, কিডনি অকার্যকর ইত্যাদি সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া তারা দীর্ঘক্ষণ ঘরের মেঝে অথবা খাটে বসে কাজ করার ফলে আরগনমিক (Ergonomic) সমস্যা যেমন-পা, হাঁটু, কোমর, মেরুদণ্ড ও ঘাড় ব্যথা, চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস ইত্যাদি সমস্যায় ভোগেন। অধিকন্তু গৃহভিত্তিক শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ছোটো খাটো দুর্ঘটনা ও রাসায়নিক ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

যদিও দেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে গৃহভিত্তিক কাজ, তথাপি বাংলাদেশে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পাবার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। বাংলাদেশের শ্রম আইনে তারা শ্রমিক হিসেবেও স্বীকৃত নয়। অথচ তাদের কাজের ধরন, বাসস্থান পরিস্থিতি ও দেশের অর্থনীতিতে তাদের আয়ের অবদান কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পাবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশ সরকারের যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ নির্ধারণ করা হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতকে প্রাতিষ্ঠানিককরণসহ এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রতি আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে গৃহভিত্তিক শ্রমিক সংক্রান্ত আইএলও' কনভেনশন ১৭৭ অনুসমর্থন করত দেশের শ্রম আইনে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া হতে পারে এর প্রথম সোপান। আমরা বিশ্বাস করি দেশের সজাবনাময় এই বিপুল পরিমাণ গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে দেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি আরও মজবুত হবে এবং সেই সাথে আগামী বাংলাদেশ হবে টেকসই অর্থনীতি সমৃদ্ধ একটি উন্নত দেশ।

গিগ ইকোনমি: দেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

গিগ ইকোনমি বা শেয়ারড অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রাইড শেয়ারিং, ই-কমার্স, অনলাইন মার্কেটপ্লেস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অ্যাপভিত্তিক নানা কাজে যুক্ত হচ্ছেন দেশের তরুণেরা। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে গিগ অর্থনীতির দিক থেকে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গিগ অর্থনীতির বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রযুক্তি দুনিয়ায় আলোচিত হচ্ছে।

গিগ ইকোনমি কি

ইন্টারনেট এবং অ্যাপের উপর নির্ভরশীল একটা মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী বাজার ব্যবস্থা। এটি আসলে একটি ডিজিটাল বাজারে শর্তসাপেক্ষে কাজের লেনদেন। এখানে কর্মসংস্থান সাময়িক। প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্পমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন কর্মীদের কাজে নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে কর্মীরা যেমন স্বাধীনভাবে কাজ নিতে পারে, কোম্পানিগুলোও তাদের ইচ্ছামতো কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ দেয় এবং কাজের মানের উপর পারিশ্রমিক প্রদান করে। সব কাজই অ্যাপভিত্তিক, তাই গিগ ইকোনমিতে কর্মক্ষেত্রগুলো অনলাইন রেটিংসের উপর নির্ভরশীল এবং অ্যাপের মাধ্যমেই নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেম কার্যকর হয়। এটা অনেকাংশেই বদলে দিচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি এবং চাকরি বা ব্যবসার পরিবেশ। স্বাধীনভাবে কাজ করার মাধ্যমে যে ইকোনমি সৃষ্টি হয়েছে তাই গিগ ইকোনমি।



গিগ ওয়ার্কার কারা

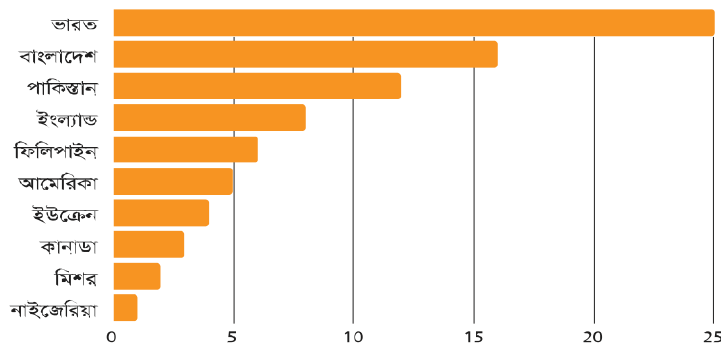
ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কর্মরত ব্যক্তি, কন্ট্রাক্ট ফার্ম এবং টেম্পোরারি কর্মীদের গিগ ওয়ার্কার বলে। আরও সহজ করে বললে মূলত ফ্রিল্যান্সাররা হচ্ছে গিগ ওয়ার্কার। গিগ ওয়ার্কারদের ট্রেডিশনাল থেকে বেশি স্বাধীনতা থাকায় এই সেক্টরে মানুষের কাজ করার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।



গিগ অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান

গিগ ইকোনমিতে বাংলাদেশের অবস্থান দিন দিন শক্তপোক্ত হচ্ছে। রাইডিং অ্যাপস থেকে শুরু করে ফুড, হেলথ, ই-কমার্সসহ বেশ কিছু সেক্টর বাংলাদেশে বেশ ভালো করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পর বাংলাদেশের অবস্থান বলে অনেকে মনে করছে। এই অর্থনীতিতে বাংলাদেশ প্রায় ১৬% এর বেশি অবদান রাখছে। বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ লক্ষের অধিক নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ শখের বেশে খুললেও এখানকার সাফল্যের হার অনেক বেশি। বিশ্ব অর্থনীতির এই টালমাটাল অবস্থায় বাংলাদেশের মত একটি দেশে ফ্রিল্যান্সিং একটি আশীর্বাদ হিসেবে ফিরেছে।

চিএ-০১ গিগ কর্মীদের অবস্থান



বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭০% ফ্রিল্যান্সারদের লক্ষ্য একটি ভাল কর্মজীবনের ভারসাম্য অর্জন করা। যখনই আমরা গিগ ইকোনমি সম্পর্কে কথা বলি, বাংলাদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ গিগ মার্কেটে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় স্থান দখল করে আছে। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এর তথ্য অনুসারে, অনলাইনে শ্রম সরবরাহের

ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্বিতীয় পছন্দের দেশ, যেখানে ভারত প্রথম। ২০২১ সালে, বাংলাদেশের গিগ কর্মী সংখ্যা ২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি অনুমান করা যায় যে ২০৩০ সালের মধ্যে, গিগ অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রেখে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এছাড়াও, কোভিড - ১৯ এর সংক্রমণের সময় লকডাউনের কারণে অনেক মানুষ চাকরি হারিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, খালি পকেটে ঘরে বসে থাকার পরিবর্তে, অনেক মানুষ গিগ মার্কেটের দিকে ঝুঁকিয়ে যাতে অন্তত পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে (এবং সারা বিশ্বে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে) গিগ কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আমাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন বাংলাদেশের দরকার সেক্টরভিত্তিক কর্মী বাহিনী তৈরি করা যা কেবল প্রচুর সংখ্যাই নয় বরং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং উচ্চমানের।

শ্রমশক্তি মানব পুঁজিতে পরিণত করতে পারলে তারা দেশের সম্পদ হিসাবে কাজ করবে। এই ধরনের সংকটের সময়ে দেশের একটি উন্নত এবং টেকসই অর্থনীতির জন্য রেমিট্যান্সের অর্থ আনতে পারে।

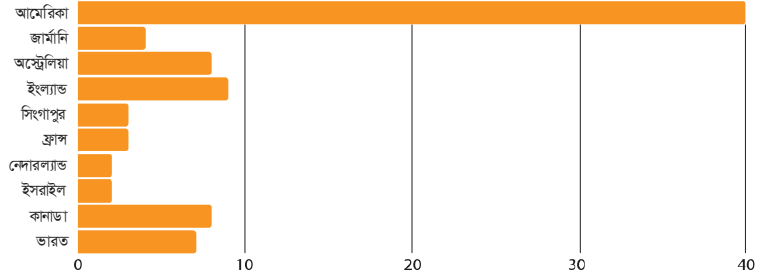
গিগ ওয়ার্কারদের আইনগত অধিকার

সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে গিগ অর্থনীতির প্রসার হচ্ছে। কিন্তু গিগ শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আইনীভাবে তাদের কোনো অধিকার নেই। মজুরি বণ্টন নিয়ে রয়েছে বৈষম্য। তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়ে ভাবার সময় চলে এসেছে। বাংলাদেশের আইনে এইসব শ্রমিকদের জন্য এবং গিগ অর্থনীতিকে পরিচালনা করার জন্য কোনো দিকনির্দেশনা বা নিয়ম-কানুন নেই। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরে গিগ বা আউটসোর্সিং এ বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে গিগ অর্থনীতি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, আগামীতে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে এই সময়ে গিগ শ্রমিকরা কাজ করেছেন। বাংলাদেশে গিগ অর্থনীতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নীতিমালা, বিধিমালা এবং আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ এসব শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের অধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ যদি দেখি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের এসব শ্রমিকদের জন্য রেগুলেশনস রয়েছে। ব্রিটেনে জেগো নামে আলাদা সংস্থা রয়েছে যারা থার্ড পার্টি লায়ালিটি ইন্সুরেন্স প্রদান করে থাকে। আমেরিকাতে উবার চালকদের অসুস্থতা, অক্ষমতা ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে ইন্সুরেন্স কভারেজ দিয়ে থাকে। ফ্রান্স গিগ শ্রমিকদের নিরাপত্তায় ও দাবী আদায়ে ২০১৬ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। এমনকি পাকিস্তানেও গিগ শ্রমিকদের জন্য চুক্তি আইন, ১৮৭২ ও দেওয়ানী বিধিমালা, ১৯০৮ এর কিছু নিয়ম-কানুন মেনে থাকে। বাংলাদেশে কর্মরত গিগ শ্রমিকদের জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ গিগ বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা;
- গিগ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে দাবী আদায় করা;
- সামাজিক সুরক্ষা, ইন্সুরেন্স এবং পেনশনের আওতায় আনা এবং
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

চিত্র- ০২ গিগ কর্মীদের নিয়োগকারীদের অবস্থান



গিগ ওয়ার্কারদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শোভন কাজের এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর অর্থ হল কর্মক্ষেত্রের এমন অবস্থা যেখানে শ্রমিকরা সব ধরনের বিপদ ও ঝুঁকি থেকে মুক্ত। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক/কর্মীর পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিক বা নিয়োগকর্তার। কিন্তু অর্থনীতিতে অবদান রাখা সত্ত্বেও গিগ ওয়ার্কাররা শ্রম আইন অনুযায়ী এখনো শ্রমিকের স্বীকৃতি পায়নি এবং তাদের কোন সুনির্দিষ্ট মালিক বা নিয়োগকর্তাও নেই। সেকারণে গিগ ওয়ার্কারদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি এখনো আমাদের বিবেচ্য বিষয় হয়নি। কিন্তু নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রত্যেকের অধিকার। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে শ্রমিক/ কর্মীরা যেমন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হবে পাশাপাশি অল্প বয়সে কর্মক্ষমতাও হারাতে পারে। গিগ ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা এবং কিছু অনলাইন আর্টিক্যাল পর্যালোচনা করে সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) দেখেছে যে, গিগ ওয়ার্কারদের পেশাগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ হচ্ছে:

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা;
- সড়ক দুর্ঘটনা;
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম না থাকা;
- কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকায় শারীরিক ও মানসিক অবসাদ;
- দীর্ঘক্ষণ বিরতি ছাড়া বসে/ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পিঠ, পা এবং হাঁটু ব্যথা;
- ব্যায়াম করার জন্য সময়ের স্বল্পতা;
- স্বাস্থ্যকর খাবার না খাওয়া;
- শৌচাগারের সুবিধা না থাকার ফলে সীমিত পরিমাণ পানি/তরল পান;
- মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং
- সেবা/পণ্য গ্রহীতার থেকে শারীরিক বা মানসিক হয়রানি ইত্যাদি।

গিগ ইকোনমি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন একটি দ্বার খুলেছে যেখানে শ্রমিক/কর্মীরাই এইখাতে মূলধন। এই খাতকে আরও বিস্তৃত করতে হলে গিগ ওয়ার্কারদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য –“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ” সফল করতে এসআরএস’র পক্ষ থেকে গিগ ওয়ার্কারদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে সুপারিশসমূহ:

- কর্মী সরবরাহকারী এবং এজেন্সি, কর্মীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোম্পানির নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলা নিশ্চিত করা;
- অধিকার স্পষ্ট করার জন্য শ্রমিকদের সাথে চুক্তি;
- শ্রমিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান;
- কর্মীদের পেশাগত ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নিরসনের পদ্ধতি আপডেট করা;
- কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা;
- মজুরি নিশ্চিত করা এবং
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

গিগ অর্থনীতি শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের এ সেক্টরে কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনই সময় গিগ অর্থনীতিতে কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে চিন্তা ও কাজ করা।

Occupational Hazards



Sk Akhtar Ahmad

Professor of Occupational & Environmental Health
Bangladesh University of Health Sciences, Dhaka

Introduction

Occupational health and safety in the workplace have improved in the last two to three decades, particularly in developed countries. However, there is still a need to address workplace health and safety determinants in order to make it more effective and appropriate. Workplace accidents and injuries continue to be serious problems both in developing and developed countries. Workplace accidents or illnesses not only cause loss and damage but are also costly to the workers, their families, and the country as a whole, through their direct and indirect effects.^[1,2,3]

According to the ILO, throughout the world, over 2.3 million people each year which is about 6,000 people per day, die as a result of work-related diseases. It also claims that about 340 million occupational accidents and 160 million work-related illnesses occur each year. Furthermore, it is estimated that 860,000 people are injured on the job every day.^[2,3,4] WHO reported that in 2016, almost 2 million deaths occurred due to work-related diseases and injuries. The majority (81%) of these deaths were due to respiratory and cardiovascular diseases, and the remaining 19% (360,000) occurred due to occupational injuries. WHO report further specified that 19 occupational risk factors were responsible for these deaths. Some common risk factors were long working hours and exposure to air pollution in the workplace, carcinogens, ergonomic risk factors, and noise.^[5] A joint estimates by WHO/ILO revealed that in 2016, Some 488 million worked for long working hour, ≥ 55 hours per week. Which was responsible to cause 745,194 deaths due to ischaemic heart disease and stroke. These diseases contributed 4.9% of all deaths.^[6] According to ILO, the death of workers at work almost 6 times more than the death due to occupational accident.^[3] However, in the USA, the Bureau of Labor Statistics reported that in 2020, about 2.7 million non-fatal workplace injuries and illnesses occurred in private industries, of which 2.1 million were non-fatal injuries and 0.54 million illnesses.^[7] ILO has estimated that occupational diseases and accidents cost the world 4% of its annual GDP.^[8]

In Bangladesh, BLS reported that in 2021, 1053 workers killed and 594 injured due to workplace accidents and among them majority were male. [9] However, according to OSH profile, from 2015 to 2018, 1163 accident cases were reported to DIFE, of which 15% were fatal.^[10]

Occupational deaths and injuries could be prevented, if workplace hazards and risks are reduced. Workers in the workplace face a multitude of hazards, but most of them remain unnoticed or unattended, which leads them to suffer from various injuries and illnesses. Thus, work-related accidents and diseases continue to be serious problems in all parts of the world, especially in developing countries including Bangladesh.^[1,3,11]

Hazard^[12,13]

Hazard is a source of danger, risk, or harmful factor. Any real or potential condition that can cause injury, illness, damage, or death is known as hazard. A hazard is any practice, behaviour, substance, condition, or combination of these that can cause injury or illness to people, or damage to property. Hazard is an inherent properties of a substances, mixture of substances or a

process involving substances that, under production, usage or disposal conditions, make it capable of causing adverse effects to worker or the environment.

Hazard is potential to cause harm but it depends upon the degree of exposure. Without exposure to hazards there will be no risk. Risk is the probability or likelihood of occurrence of harm due to exposure to hazards. The occurrence of harm or event depends upon the extent of risk. The extent of risk is evaluated by assessment of exposure to various levels of a hazard. It estimates how much exposure to a hazard poses health risks and can cause harm.

Occupational Hazard^[13-16]

An occupational hazard is a source or situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment, or a combination of these. An occupational hazard is a factor or condition at work or in the workplace that may cause adverse effects on the health and safety of a worker who is exposed to such a factor or condition.

There is no occupation without hazards; they may go unnoticed or remain silent. They exist as an inherent component of the workplace, whether we recognize them or not. Some are easily identified and corrected, while others may create extremely dangerous situations that may endanger life or have long-term health consequences.

Depending on the work environment, work process, raw materials used, production, and waste disposal, different occupations have different hazards. Occupational hazards can be divided into two categories: 1) **Safety Hazard**- that causes accident and physically injure workers, and disable 2) **Health Hazard**- that results in the development of disease or illness.

A. Occupational Safety Hazards:

Occupational safety hazards are the most common and are present in most workplaces. They include unsafe conditions and unsafe work practices that can cause injury, illness, and death.

a) **Unsafe conditions** include:

- Spills on floors or tripping hazards, such as blocked aisles or cords running across the floor,
- Working from heights, including ladders, scaffolds, roofs, or any raised work area.
- Unguarded machinery and moving machinery parts; guards removed or moving parts that a worker may touch inadvertently
- Electrical hazards like frayed cords, missing ground pins, improper wiring
- Confined spaces
- Machinery-related hazards- forklifts, boiler safety, cranes, etc.

b) **Unsafe work practices:** Poor work practices create hazards. Unsafe work practices commonly found in the workplace include:

- Using machinery or tools without authority or proper training
- Operating at unsafe speeds or in violation of safe work practices.
- Removing or disabling guards or other safety devices on machinery or equipment.
- Using defective tools or equipment or using tools or equipment in unsafe ways.
- Using one's own hands or body rather than tools or push sticks
- Overloading, crowding, failing to balance materials or handling materials in other unsafe ways, including improper lifting.
- Repair or adjust equipment that is in motion, under pressure, or electrically charged.
- Failing to use and/or maintain personal protective equipment or safety devices, or using them incorrectly

- Creating unsafe, unsanitary or unhealthy conditions through improper personal hygiene, poor workplace maintenance or
- Smoking in unauthorized areas.
- Standing or working in the presence of suspended loads, scaffolds, shafts, or open hatches.

B. Occupational Health Hazards:

In the case of an occupational or workplace health hazard, the harm is to a worker's health and usually takes the form of an illness. Most workplace health hazards target a particular part of the body, such as the lungs, skin, kidneys, or liver. A large number of workplace diseases and disease agents are recognized. Any part of the body can be affected in some way by some workplace health hazard. An important consideration is how exposure to a hazard occurs.

Occupational health hazards in the workplace can be found in a variety of forms, including chemical, physical, biological, psychological, and non-application of ergonomic principles. Occupational health hazards can be classified as:

- 1) Physical
- 2) Chemical
- 3) Biological
- 4) Psychosocial
- 5) Ergonomical

- 1) **Physical hazards-** are the factors within the work environment that can harm the body without necessarily touching it, such as noise, heat, vibration, radiation, magnetic fields, pressure extremes, (high pressure or vacuum), etc,
- 2) **Chemical hazards-** physical, chemical, and toxic properties of the chemical. When a worker works with any chemical preparation in the workplace in any form (solid, liquid, or gas), some are safer than others, but for some workers who are more sensitive to chemicals, they may cause illness, skin irritation, breathing problems, or other health consequences.
- 3) **Biological hazards-** bacteria, viruses, insects, plants, birds, animals, humans, etc., which are associated with working with animals, people, or infectious plant materials. Working in hospitals, laboratories, emergency response, nursing homes, tannery, animal husbandry, etc. may expose the individual to biological hazards.
- 4) **Psychosocial hazards -** hazards or stressors that cause stress (short-term effects) and strain (long-term effects). These are the hazards associated with workplace issues such as workload, lack of control and/or respect, promotion, violence, etc.
- 5) **Ergonomical hazards-** include repetitive movements, improper workstation setup, work type, body positions, and working conditions, long working hours, etc., that put strain on the body. Exposure to these factors causes various musculoskeletal disorders (MSDs).

Prevention and Control Occupational Hazards^[14,16-18]

The aim of control of hazards is to prevent workers from being exposed to occupational hazards. By reducing or eliminating hazards and their consequences, effective occupational health and safety programs can help to save workers' lives. Health and safety programs have a positive impact on worker morale and productivity, both of which are substantial benefits. Effective programs, on the other hand, can save a employer a significant amount of money in the long run.

Principles:

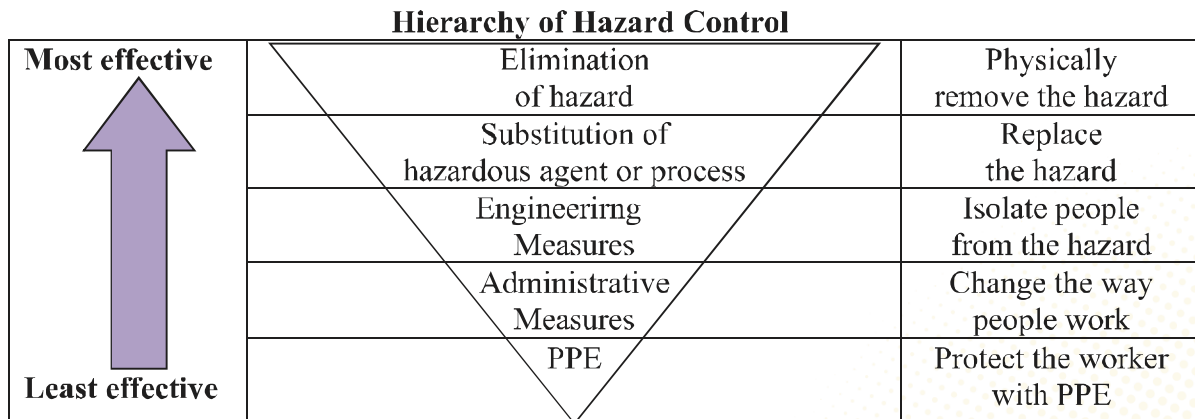
- Engineering controls that physically adjust a machine or work environment to prevent employee exposure to the hazard are the most effective.
- The less likely it is that a hazard control system can be by passed, the better.
- Administrative restrictions may be appropriate if this isn't possible or feasible,
- This may entail changing how employees perform their duties.
- Discuss the recommendations with all employees who do the job and carefully consider their responses.
- When introducing new or updated job practices, make sure employees understand what they will be doing and why the changes are being made.

Prevention and control of occupational hazards can be done by

- 1) **Engineering measures** – The aim of engineering control is to decrease or eliminate hazards, as well as exposure to them. It comprises designs or adjustments to plants, equipment, ventilation systems, processes, and so on. Engineering control is a safe guarding technology.
- 2) **Medical measures** – Periodic medical examinations and special medical examinations are required to monitor the effectiveness of engineering controls in terms of the reduction or control of occupational diseases and illnesses
- 3) **Administrative/Legal measures** – Administrative measures emphasize reducing exposure by changing the way things are done, such as work scheduling, policies and other rules, work practices, housekeeping, and equipment maintenance, as well as personal hygiene practices, standards operating procedures, and training.

Hierarchy of Control of Hazards^[17-18]

The hierarchy of control measures includes: elimination, substitution, engineering controls, administrative controls, and personal protective equipment. A combination of methods usually provides a safer and healthier workplace than relying on only one method.



- 1) **Elimination-** The most effective strategy to reduce hazards is to eliminate or prevent a specific hazard from entering the workplace, yet this is difficult to integrate into an existing process. But it is easier to eliminate hazards when a work process is being established.
- 2) **Substitution-** If a particularly hazardous chemical or work process cannot be fully eliminated, substitutes a safer alternative. It is also a effective approach to reduce hazards.

- 3) **Engineering Measures-** Engineering measures in the workplace are intended to eliminate hazards at the source, before they come into contact with workers. Engineering controls that are well-designed can be highly effective in protecting workers. Enclosure, machine guard, isolation, ventilation, etc., are examples of engineering control measures.
- 4) **Administrative Measures-** Administrative measures are intended to limit the amount of time spent working at a hazardous job. It can be used in conjunction with other control methods to reduce exposure to hazards. Administrative controls do not eliminate exposures; they only shorten the duration of exposure.
- 5) **Personal Protective Equipment (PPE)-** PPE is frequently used in existing processes where hazards are not well controlled. PPE acts as a barrier between worker and the hazard. Therefore, PPE must be appropriate and properly used, otherwise, the barrier will not work properly, and the worker will be exposed to a hazard. The use of PPE to protect workers is the least effective control measure. PPE should be the last choice in control measures.

References:

1. ILO. Your health and safety at work-Introduction to occupational health and safety. International Labour Organisation, https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_113080/lang--en/index.htm
2. Leppink N. Socio-economic costs of work-related injuries and illnesses: Building synergies between Occupational Safety and Health and Productivity https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilorome/documents/genericdocument/wcms_415608
3. ILO. Global Trends on Occupational Accidents and Diseases. International Labour Organisation, https://www.ilo.org/legacy/english/osh/en/story_content/external_files/fs_st_1-ILO_5_en.pdf
4. ILO. World statistics. International Labour Organisation, https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.htm.
5. WHO/ILO. Almost 2 million people die from work-related causes each year. World Health Organisation <https://www.who.int/news/item/16-09-2021-who-ilo-almost-2-million-people-die-from-work-related-causes-cach-year>
6. Pega F, Nafrad B, Momen NC, Ujita Y, Streicher N, Pruss-Ustin AM, et al. Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. *Environment International* 2021;154:106595. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106595>
7. BLS. Employer-reported workplace injuries and illnesses–2020. Bureau of Labour Statistics <https://www.bls.gov/news.release/pdf/osh.pdf>
8. BILS. Occupational Safety and Health in Bangladesh: National Profile. Bangladesh Institute of Labour Studies-BLS, June 2015.
9. Workplace accidents killed 1053 in Bangladesh last year: BILS. Financial Express, January 10, 2022 . <https://www.thefinancialexpress.com.bd/national/workplace-accidents-killed-1053-in-bangladesh-last-year-bils-1641788705>
10. DIFE. National Occupational Safety and Health (OSH) Profile-2019. Department of Inspection for Factories and Establishments, Ministry of Labour and Employment, September, 2019

11. ILO. Safety and health at work in Bangladesh, International labour Organisation. International in Bangladesh. <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>
12. OSHA. Hazard identification and prevention. Occupational Safety and Health Administration. https://www.osha.gov/sites/default/files/2018-12/fy10_sh-20854-10_hazard_id_facilitatorguide.pdf
13. 12a.CCOHS. Hazard and Risk. Canadian Centre for Occupational Health and Safety https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_risk.html
14. OSHA. Defining and Classifying Occupational Hazards. Occupational Safety and Health Administration. <https://hazwoper-osa.com/blog-post/defining-and-classifying-occupational-hazards/>
15. Safety Culture. Workplace Hazard. <https://safetyculture.com/topics/workplace-hazards/>
16. OSHA. Safety hazard. Occupational Safety and Health Administration. https://www.osha.gov/sites/default/files/2018-11/fy10_sh-20839-
17. ILO. Your health and safety at work-Controlling Hazards. International labour Organisation. International labour Organisation https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_113080/lang--en/index.htm
18. NIOSH. Hierarchy of Controls. The National Institute for Occupational Safety and Health <https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html>

কর্মক্ষেত্রে কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা



মোঃ তাওহীদুল হক ভূইয়া
সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে ব্যাপক গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়ে থাকে। তবে স্বল্পোন্নত কিংবা অনুন্নত দেশগুলোতে কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে মালিক কিংবা শ্রমিক উভয় শ্রেণিরই ব্যাপক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক সুস্থতাকে যে ধরনের গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিক ততটাই অবহেলা করা হয় মানসিক সুস্থতার বিষয়টি। আর প্রেক্ষাপট যখন বাংলাদেশ তখন মানসিক অসুস্থতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মী যেকোনভাবে গোপন করার চেষ্টা করে থাকেন। এর পেছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। যখনই মালিকপক্ষ জানতে পারেন যেকোন শ্রমিক মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থতায় রয়েছেন তখন তাকে তার কর্মক্ষেত্রে থেকে অনিয়মিতভাবে ছাঁটাই করে ফেলা হয়। অথচ সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হলে সেই শ্রমিকটি হতে পারতেন প্রতিষ্ঠানের একজন দক্ষ জনশক্তি এবং অধিক উৎপাদনক্ষম।

সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি বছর প্রায় ২০ থেকে ২১ লক্ষ মানুষ দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী দেশে কর্মক্ষম মোট ৬ কোটি ৩৫ লাখ মানুষের মধ্যে ৬ কোটি ৮ লাখ লোক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিপুল পরিমাণ মানুষের শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি এক বিশাল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। পছন্দসই কর্মক্ষেত্রে না পাওয়া, চলমান বাজারমূল্যের সাথে বেতনের অর্থের অসামঞ্জস্যতা পূর্ণ অপ্রতুলতা, নির্দিষ্ট সময়ে পদোন্নতি না পাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই বিশাল কর্মীগোষ্ঠীর সিংহভাগকেই বিভিন্ন মানসিক জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ফলে দেখা গেছে বিষন্নতা ও মানসিক অসুস্থতাজনিত কারণে বছরে গড়ে প্রায় ৩৬ কর্মদিবস নষ্ট হয়। তবে বিষন্নতায় আক্রান্তদের মধ্যে ৫০ শতাংশ কর্মী চিকিৎসাসেবা নেন না। উন্নত বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী বিষন্নতা ও মানসিক অবসাদগ্রস্ততার কারণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। অথচ চাকুরি হারানোর ভয়ে সেসব কর্মীরা কখনোই সমস্যার কথা মুখ ফুটে বলেন না। নারী কর্মী কিংবা শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, কাজের অত্যধিক চাপ, পারিবারিক সমস্যা, দাম্পত্য কলহ, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরূপ আচরণ এবং উদ্বেগ এসবই মানসিক অবসাদের কারণ। এছাড়াও নারীর প্রতি যৌন নিপীড়ন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতির ক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রভাবক।

কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি নিপীড়ন অবসানের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন (২০০৮ সালের ৫৯১৬ নং রিট পিটিশন)। বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২(২)(ক)(ii) অনুচ্ছেদ অনুসারে দায়েরকৃত এই রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকির বেঞ্চ দেশীয় বিভিন্ন সেক্টরের কেস স্টাডি পর্যালোচনা করে এবং একইসাথে নারী অধিকার সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন, প্রটোকল, কনভেনশন ও ঘোষণাসমূহ বিশেষ করে ১১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই প্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিজ কার্যালয়সহ এর আওতাধীন প্রযোজ্য সকল প্রতিষ্ঠানে “নারী নিপীড়ন নিরোধ কমিটি তথা “এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি” গঠনের নির্দেশনা জারি করে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে শ্রমিক এবং মালিক উভয়কেই সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে নারী কর্মীরা যেন কোনভাবেই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার না হোন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রমিক নিয়োগের সময় শ্রমিকের স্বাস্থ্যগত দিকের পাশাপাশি মানসিক সামর্থের বিষয়টিও আমলে নিতে হবে। কর্মীদের মানসিকভাবে চাপা রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ প্রদানের দিকে নজরদারি বাড়াতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন-পিকনিক, চা চক্র, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিকদের মানসিকভাবে চাপা রাখা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা বিশ্রাম কক্ষ, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার এবং তাদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার রাখতে হবে। প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ -তে শ্রমিকের এসকল স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি একজন শ্রমিকের কর্ম হারানোর ভয় যেন না থাকে সে বিষয়ে মালিকপক্ষকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। সম্ভব হলে নিজ প্রতিষ্ঠানে একজন মনোবিদ নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। সেটি সম্ভব না হলে অন্তত মানসিক অবসাদে আক্রান্ত শ্রমিক যেন তার সমস্যা দূরীকরণে যথাযথ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে। কারণ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ একজন শ্রমিক তার কর্মদক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে যেতে পারেন অনন্য উচ্চতায় এবং হয়ে উঠতে পারেন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের সম্পদ ও দক্ষ জনশক্তি।

GO GREEN AND MAKE AN ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS WORKPLACE



Dr. Irin Hossain

Assistant Professor

Head of The Department

Department of Occupational and Environmental Health

National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM)

Various types of components that play a vital role in developing an eco-friendly workplace culture depend on healthy and comfortable working conditions. It is more vital than decent salary and workplace advantages to keep people comfortable in their current work environment. A healthy work environment inspires employees to create a healthy environment for the rest of the world.

Rather than working on projects together, an employer and employee must have a close and beneficial working relationship. If an employer provides the finest possible working environment for his employees, they will be more productive and engaged. It means that communication and understanding between the company and the employee about healthy workplace issues can help to protect the environment across the world. According to numerous studies, a green atmosphere can aid in increasing inventiveness.

As a result, the presence of green tints in the workplace environment might help employees relax and think more creatively. Sharing thoughts and opinions about the workplace can also serve to improve the working environment.

Employees must be involved in the employer's environmental goal for the workplace. Getting employees to put forth effort will allow them to embody and accept the new mission and goals.

From promoting workplace well-being through a mindful and healthy work environment to allowing team members to consider the big picture, encouraging environmentally sound practices in the workplace will make employees feel better, increase their satisfaction with the company, and motivate them to succeed at work. Above all, the value of an organization's leaving a long-lasting impact on environmental effects will remain for generations.

Employers and employees must collaborate to achieve the goal of creating an environmentally friendly workplace. Various efforts should be performed to see the benefits of an environmentally sustainable work environment, such as;

Both the company and the employees establish a long-term team for their workplace, focusing on successful recycling programs, energy efficiency, and green cleaning materials, as well as engaging one another in effective learning.

- ◆ Introducing a green fund or environmental fund.
- ◆ Providing environment-friendly workplace materials.
- ◆ Providing green energy plans generated by renewable energy sources.
- ◆ Taking necessary steps to reduce energy use.
- ◆ Using contemporary technologies to eliminate some paperwork burdens, resulting in a lower carbon footprint and a more pleasant workplace atmosphere.
- ◆ Bringing nature into the office, such as a desk plant, can help to improve the workplace's indoor air quality.
- ◆ Maximum use of natural light can limit energy consumption.

The office environment is the most essential aspect of work-life that influences employee engagement and productivity. A better work environment can reduce employee absences, boost employee self-esteem, and make the office a less stressful place to work.



আলোকচিত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

আলোকচিত্রী:
রিয়াজ মাহমুদ মিরু
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



আইএলও কনভেনশন-১৩৮ অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। আইএলও'র সদর দপ্তরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপত্র আইএলও'র মহাপরিচালকের হাতে তুলে দেন। (২২.৩.২০২২)



শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩০টি কলকারখানাকে 'ছিন্ন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০' প্রদান করে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী-এর সঙ্গে অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ। (৮.১২.২০২১)



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আয়োজনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে “চতুর্থ শিল্পবিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়”-শীর্ষক কর্মশালা। (১৩.৩.২০২২)



ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শ্রম অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অগ্রগতি পর্যালোচনামূলক সভা। (১৪.৩.২০২২)



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সাভারে আয়োজিত 'স্ট্র্যাটেনিং লেবার ইন্সপেকশন টু কমব্যাট চাইল্ড লেবার' শীর্ষক কর্মশালা। (০৩.১০.২০২১)



প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকসহ অসহায়, দরিদ্র মানুষের জন্য মুন্সিগঞ্জে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দিনব্যাপী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প। (১৯.০৯.২০২১)



পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০)-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহীসহ অংশীজনগণ। (১০.০২.২০২২)



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের Labour Inspection Report ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন (৩০.০৯.২১)



জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের ১১তম সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান, এমপি (১০.০২.২০২২)



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আয়োজিত OSH policy 2013 review workshop (১০.১০.২০২১)



“National OSH Program, OSH system and OSH Standard” শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ (১০.০২.২০২২)



Workshop on Standard Operating Procedure (SOP) on Occupational Diseases (১৮.০১.২০২২)



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-৭) সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র গ্রহণ করছেন প্রথম স্থান অধিকারী মোঃ ফরহাদ মাহমুদ সোহাগ



প্রশিক্ষকগণের সঙ্গে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ৭ম ব্যাচের প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ।



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৮ম ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠান



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৯ম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৯ম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীগণ



নির্মাণাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০



International
Labour
Organization

Canada



Kingdom of the Netherlands